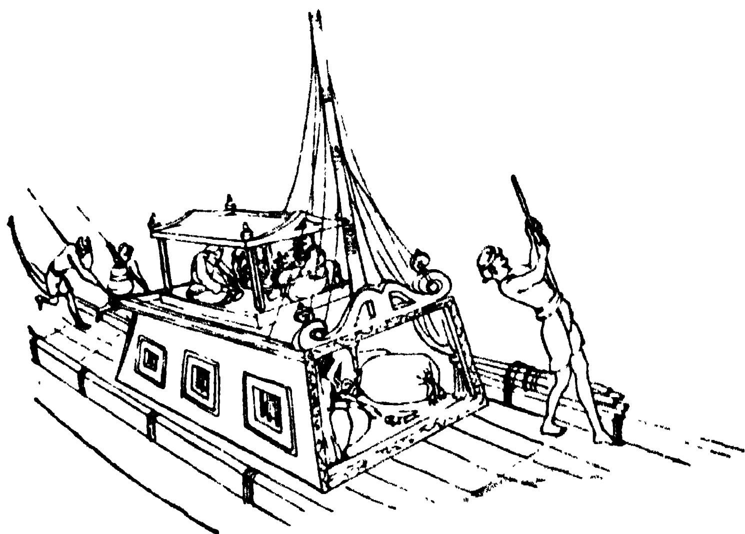


নগর সংকীর্তন

নফর সংকীর্তন

বিমল মিত্র

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

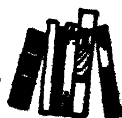
প্রথম সংস্করণ :
৭ই জ্যৈষ্ঠ,
১৮৮৪ শকাব্দ

টা. ২'৫০

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬



উৎসর্গ

রামপরায়ণ রায়

প্রীতিভাজনেষু—



বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার পাঠক সাধারণের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, সম্প্রতি 'বিমল মিত্র'-এর নামে দু' তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি আমার লেখা নয়। আমার প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রথম পাতায় আমার নিজের সই দেওয়া থাকে। ইতি—

বিমল মিত্র

পাড়ার ছেলে আমরা। আমাদের পাড়ার সব লোকই আমাদের মতন মধ্যবিত্ত। আগে এখানে এমন ছিল না শুনেছি। শুনেছি, তখন আশেপাশের এ-সব নাকি মাঠ ছিল। এখন বাড়ি হয়ে গেছে চারদিকে। আগে শুধু ওই একখানা বাড়িই ছিল এদিকে। চারদিকে অনেকখানি জমি নিয়ে বেশ খেলিয়ে ছড়িয়ে বাস করবার জন্যে কোন্ এক সংসার সেন নাকি এইখানে প্রথম বাড়ি করেন। তাঁরই বংশধর এরা। আগে মাত্র ওই একটা বাড়িতেই দুর্গাপুজো হতো। পুজোর সময় আমরা ঠাকুর দেখতে যেতাম এই বাড়িতে। বড়লোকের বাড়ি। বড়লোকের যে বাড়ি তা এখনও চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। সামনে মস্তবড় গেট। তখন বাড়ির গেটে দরোয়ান পাহারা দিত। বিকেলবেলা সেনবাবুদের কোঁচানো ধুতি, বাহারে পাঞ্জাবি প'রে মাথার চুলে তেড়ি বাগিয়ে গাড়ি চড়ে বেড়াতে যেতে দেখেছি। বাড়ির ভেতরে ঢুকতে ভয় লাগতো। প্রথম যখন আমরা এলাম তখনও জানতাম ওরা বড়লোক। ওদের সঙ্গে আমাদের অনেক তফাত। ওদের সমাজ আমাদের থেকে আলাদা। দরোয়ান ঝি চাকর সরকার মুহুরি কোনও কিছুরই অভাব নেই বাড়িতে। কিছু কিছু দেখতে পেতাম দুর্গাপুজোর সময়। পাথের কাজ-করা দেয়াল। বাড়িতে সামনে বাগান মতন ছিল। হাঁস ছিল, ময়ূর ছিল, কাকাতুয়া পাখী ছিল। মানে, বড়লোকের বাড়িতে যা থাকতে হয় সবই ছিল।

তারপর ক্রমে ক্রমে সে-বাড়ির চেহারা যেন ম্লান হয়ে যেতে লাগলো। যত দিন যেতে লাগলো, দেখতাম বাড়িটা যেন আরো পুরোনো হয়ে যাচ্ছে। দেয়ালে রং পড়ে না। ঘোড়া মরে গেলে আর ঘোড়া কেনা হয় না। চাকরবাকরদের কাপড় জামা ক্রমেই ময়লা হতে লাগলো। অথচ আশে-পাশের অন্য বাড়িগুলো তখন ক্রমেই মাথা তুলে উঠছে। সে-সব রং-বেরং-

এর বাড়ি, তাদের জানালায় পর্দা ঝোলে, ভেতরে রেডিও বাজে, নতুন মটরগাড়ি আসে গ্যারেজে।

ঠিক এইরকম সময়ে একটা কাণ্ড ঘটলো।

আগের দিনও দেখেছি সেন-বাড়ির বড়বাবু সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে কোথায় যেন বেরিয়ে গেল। ভাঙা গেট্‌টা বন্ধ করে দিলে ওদের দরোয়ান ভূষণ সিং। তারপর রাত হয়েছে, সেন-বাড়ির ঘরে ঘরে আলোও জ্বলেছে, আবার মাঝ-রাত্তিরের পর সমস্ত বাড়িটা নিঝুমও হয়ে গেছে। যেমন অন্যদিন অন্ধকারে সমস্ত বাড়িটা হাঁ-হাঁ করে, সেদিনও তেমনি নির্জীব নিষ্প্রাণ হয়ে সারা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাড়িটা কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে।

কিন্তু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই সবাই অবাক হয়ে গেছে।

বাড়ির সামনে পুলিশ!

তিন-চারটে লাল-পাগড়ি-পরা পুলিশ, আর একজন দারোগাও আছে। পুলিশ দেখে সবাই জড়ো হলো বাড়ির সামনে।

—কি হয়েছে মশাই?

—হ্যা মশাই, কী হয়েছে এখানে?

একজন বললে—হ্যাঁ মশাই, নফ্‌রা বলে একটা লোক থাকেনা এই বাড়িতে?

একজন বললে—নফ্‌রা না মশাই, নফর তার নাম,—

—ওই হলো! ওই একই কথা, যার নাম চাল-ভাজা তারই নাম মুড়ি। সেই বেটাই বোধহয় চুরি-টুরি কিছু করেছে—

—চুরি-টুরি নয়, ডাকাতি হবে, ডাকাতি না হলে এত পুলিশ আসে?

একজন বললে—না মশাই, শুনছি গলায় দড়ি দিয়েছে—

হঠাৎ দেখা গেল গুলমোহর আলি গাড়ি চালিয়ে বাড়ির দিকেই

আসছে। সবাই সরে দাঁড়াল। গাড়ির মধ্যেই বড়বাবু আছে, জগত্তারণবাবু আছে।

আর গাড়ির মাথায় ?

গাড়ির মাথায় গুলমোহর আলির পাশে পা ঝুলিয়ে বসে আছে নফর, দিব্যি কোঁচানো ধুতি পরেছে, বাহারে পাঞ্জাবি পরেছে, তেড়ি বাগিয়েছে—

আর···

কিন্তু পুলিশ-দারোগার ব্যাপারটা পরে বলছি। আগে নফরের সংকীর্তন শুনুন।

এ-সংকীর্তনেরও একটা গৌরচন্দ্রিকা আছে।

সেনেদের বাড়ির সুবর্ণ সেন একদিন ভোর এগারোটার সময় নিজের বিছানার ওপর আড়ামোড়া ভেঙে চোখ মেললেন। চোখ মেলতেই খাস-বরদার পাঁচু এক হাতে বোতল আর এক হাতে সিগারেটের কৌটোটা এগিয়ে ধরতে গেল।

সুবর্ণবাবু হাই তুলতে তুলতে বললেন—হ্যাঁরে, নফর কোথায় থাকে রে ? নফরকে আর দেখতেই পাই না,—সে কি মরে গেছে ?

পাঁচু বললে—আজ্ঞে আমি এখুনি ডাকছি তাকে—

খাস-বরদার পাঁচু কাঁধের তোয়ালেটা গুছিয়ে নিয়ে দৌড়ুল। নফরের ডাক পড়েছে। চারটিখানি কথা নয়। বাইরে দিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি। সিঁড়িটি সোজা নিচের বার-মহলে নেমে গেছে। খাস-বরদার ওই সিঁড়ি দিয়ে নামবে। ওটা অপবিত্র সিঁড়ি। নিষিদ্ধ জিনিসপত্র ওই সিঁড়ি দিয়ে আসবে যাবে। ভেতরের সরকারী সিঁড়ি গঙ্গাজল দিয়ে ধোয়া-মোছা হয়। সে-সিঁড়ি দিয়ে মা-মণির পুজোর নৈবিদ্যি ওঠে, পুরুতমশাই

ওঠেন বো-মণির ঠাকুর-পুজোয়। আরো অনেক জিনিস যায়। নারায়ণ-শিলা যায়, ঠাকুরের প্রসাদ যায়। কিন্তু সুবর্ণবাবুর ফাউল-কারি, বোতলের ওষুধ, তার জন্যে বাইরের সিঁড়ি। এ-নিয়ম বোধহয় সেই সংসারবাবুর আমল থেকেই চলে আসছে। এতদিন পরে আর কেউ প্রশ্নও করে না, মাথাও ঘামায় না ও-সব নিয়ে।

পাঁচুর সঙ্গে ঠিক বার-বাড়ির মুখেই হরি জমাদারের দেখা।

—এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছো গো খাস-বরদার ?

পাঁচুর তখন কথা বলবার সময় নেই। কাঁধের তোয়ালেটা সামলাতে সামলাতে বললে—এখন কথা বলবার সময় নেই গো, বড়বাবু নফরকে ডেকেছে—

নফরের ডাক পড়েছে! হরি জমাদার ঝাঁটা নিয়ে বার-বাড়ির উঠোনের দিকে যাচ্ছিল। বললে—নফরের ডাক পড়েছে!

হরি-জমাদারের বউ-বেটা থাকে বাড়ির পেছন দিকের বাগানের কোণটায়। আস্তাবল-বাড়ি পেরিয়ে নোংরা আঁস্তাকুড় আর পচা ডোবাটার পাশে। হরি জমাদার ঘরে গিয়ে ফরসা ফতুয়াটা পরে নিলে।

বউ বললে—ফতুয়া গায়ে দিচ্ছ যে ? কোথায় যাচ্ছ ?

হরি জমাদারের কথা বলবার সময় নেই। শুধু বললে—নফরের ডাক পড়েছে, আমি চলি—

ফুলমণি বাসন মাজছিল কলতলায়। এক কাঁড়ি এঁটো বাসন। বার-বাড়ির বাসন মাজে ফুলমণি। ফাউল-কাটলেট আর মুরগীর ডিমের ছোঁয়া বাসন সব। ফুলমণি সেই বাসন নিয়ে বার-বাড়িতে রেখে দেবে। ও-বাসন ভেতরে ঢুকবে না। ফুলমণি ভেতরের বাড়ির সিন্ধুকে ছোঁবে না। সিন্ধু মা-মণির খাস-অন্দরের বাসন মাজে।

সিন্ধু বলে—ছুঁসনে ছুঁসনে, সরে যা—এই ভাখ্, ছুঁয়ে দিবি নাকি না ?

ফুলমণি বলে—আমি কাচা কাপড় পরেচি গো, বাসনের পাট সারা করে কাচা কাপড় পরেচি, এই ভাখো—

—রাখ্ তোর কাচা-কাপড়, তোর জাত-জন্ম কিছু আছে নাকি লা ?

এ-বাড়ির, এই সংসার সেনের আদি বাড়ির ভেতরে-বাইরে অনেক স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য জীব আছে; তাদের জীবন-ইতিহাস কেউ জানে না। বাইরের বাসনই শুধু নয়, বাইরের মানুষও ভেতরে যেতে পারে না। বার-বাড়ির দরজা থেকেই ফুলমণি ডাকে— ওলো, ও সিন্ধু, এক খামচা তেল দে তো হাতের তেলোয়—

সদর দরজার ওপারে যাবার তার অধিকারও নেই, এক্তিয়ারও নেই। এ-পারের ভিজে কাপড়ের জল ওপারে ছিটোতে পাবে না। এ দিকের মাছের কাঁটা ও-বাড়ির উঠোনে যদি কাকে নিয়ে ফেলে দেয় তো ও-বাড়ির উঠোন অশুদ্ধ হয়ে যায়। তখন ভারি ভারি জল আসে কলসীতে। কলসী-কলসী জল ঢালা হয় উঠোনে। মা-মণি ওপরের বারান্দা থেকে তদারক করেন। বলেন—ও সিন্ধু, পৈঁঠেটা শুক্‌নো রইলো যে, ওখেনটায় জল ঢেলে দে—

আজ কিন্তু ফুলমণি সিন্ধুকে দেখতে পেয়েই বললে—হ্যাঁ লা সিন্ধু, বড়বাবু নাকি নফরকে ডেকেছে ?

—কে বললে ? কোত্থেকে শুনলি ?

সিন্ধুর মুখের চেহারাটা সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে।

ফুলমণি বললে—জমাদারের মুখে শুনলুম—

সিন্ধু বললে—জমাদারকে কে বললে ?

কে বললে কেউ জানে না। কথাটা কোথা থেকে উঠলো, কে প্রথম শুনেছে, কেউ-ই জানে না। কিন্তু হৈ-হৈ পড়ে গেল বাড়িতে। মহলে-মহলে এক কান থেকে আর এক কানে ছড়ালো।

—হ্যাঁ গা, বড়বাবু নাকি আজ নফরকে ডেকেছে ?

—কই, বড়বাবু তো এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি !

আস্তাবল-বাড়িতে গুলমোহর আলি চিৎপাত হয়ে শুয়ে ছিল। তার খাতির ছিল বড়বাবুর বাবার আমলে। বাহারও ছিল। কালো আর বাদামী দুটো ঘোড়া ছিল তখন। বাড়ি থেকে গাড়ি বেরোবার সময় পাড়ার লোক হাঁ করে চেয়ে দেখতো ঘোড়া-দুটোকে। আর গাড়ির মাথায় গুলমোহর আলি জরির জামা প'রে গাড়ি হাঁকাতো।

কেউ কেউ সেলাম করতো গুলমোহর আলিকে—সেলাম আলি সাহেব—সেলাম—

গুলমোহর আলির তখন দিনকাল ভালো। কর্তাবাবুকে দিয়ে কোনও কাজ করাতে হলে গুলমোহর আলিকে ধরলেই কাজ হতো। একবার একটা ভালো ময়না পাখী বেচতে আসে একজন বেদে। ওই গুলমোহর আলি তিনশো টাকা পাইয়ে দিয়েছিল তাকে। ময়নাটা কথা বলে না, বোল্ বলে না। গায়ের পালকগুলোও ভালো করে গজায়নি তখন।

কর্তাবাবু তখন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন।

বেদেটা এসে বললে—হুজুর, ময়না-পাখী লেবেন ?

কর্তাবাবুর খাস-বরদার তখন পীরজাদা। পীরজাদা হাঁকিয়ে দিচ্ছিল বাজে লোক দেখে।

বেদেটা বললে—আজ্ঞে নীলগিরি পাহাড়ের ময়না, খুব সস্তায় ছেড়ে দেব—

কর্তাবাবুর কী খেয়াল হলো। অন্যবার অন্যলোক হলে হাঁকিয়ে দিতেন। কিন্তু মেজাজ বোধহয় ভালো ছিল। চেয়ে দেখলেন ময়নাটার দিকে একবার।

বললেন—কত দাম ? পাঁচ টাকা ?

[illegible]বাবু তখন কর্তাবাবুর পেছনে ছিলেন। তিনিও কর্তাবাবুর

সঙ্গে বাগানবাড়িতে যেতেন। তিনি বললেন—পাঁচ টাকা? বলেন কি হুজুর, পাঁচ পয়সা দাম নয় ওর—ওর চোদ্দপুরুষ ময়না নয়—কালো শালিকপাখী নির্ঘাৎ—

কর্তাবাবু চটে গেলেন। বললেন—শালা ঠকাচ্ছিলি আমাকে? বেরো—

বেদেটা বললে—না হুজুর, আসল জাত-ময়নার বাচ্চা, শালিখ নয়—

দুর্লভবাবু বললেন—ও আসল শালিখ, ওর চোদ্দপুরুষ শালিখ, ময়না চেনাচ্ছে আমাকে? আলবাৎ শালিখ—শালিখ না হলে কান কেটে ফেলবো হুজুর—

কর্তাবাবুর বাগানবাড়ি যাওয়া হয়ে গেল। কর্তাবাবু বললেন—ডাকো মুহুরিবাবুকে, মুহুরিবাবুর বাড়ি চাকদায়, ও শালিখ চেনে—

মুহুরিবাবু খাজাঞ্চিখানায় কাজ করছিল। কানে কলম নিয়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে হাজির।

কর্তাবাবু বললেন—তোমার তো চাকদায় বাড়ি মুহুরিবাবু, তুমি পাখী চেনো?

—আজ্ঞে চিনতাম আগে!

—ছাখো তো, এটা ময়না পাখী কিনা?

মুহুরিবাবু চশমাটা কপালের ওপর তুলে ফেললে। কাছে মুখ এনে দেখতে লাগলো। হিসেব-পত্তোরের খাতা দেখা তার কাজ। আদায়-পত্র দেখেপাকা খাতায় তোলা তার কাজ। তারপর সেই খাতা থেকে জমা-বকেয়া আলাদা-আলাদা তুলে আলাদা হিসেব রাখতে হয়। এই কাজই চব্বিশ বছর একাদিক্রমে করছে। সেই লোককে হঠাৎ পাখী চিনতে হবে কর্তাবাবুর হুকুমে।

অনেক ভেবেচিন্তে বললে—আজ্ঞে চাকদাতে এরকম পাখী দেখিনি, তবে শালিখই মনে হচ্ছে—

বেদেটা বললে—তা হলে মল্লিকবাবুদের বাড়িতেই দিই গে গিয়ে হুজুর—বাবুরা দেড়শো টাকা বলেছিল, দিইনি—

দুর্লভবাবু বললে—কোন্ মল্লিকবাবু? কোথাকার মল্লিকবাবু?

বেদেটা বললে—আজ্ঞে, গোয়ালটুলির মল্লিকবাবু।

গোয়ালটুলির মল্লিকবাবু! কথাটা কর্তাবাবুর কানে গিয়ে খট্ করে বিঁধলো। গোয়ালটুলির মল্লিকরা কি আমার চেয়েও পাখী ভালো চেনে নাকি?

বললেন—গোয়ালটুলির কোন্ মল্লিক হে দুর্লভ? কার কথা বলছে?

দুর্লভ বললে—হুজুর, আর কার কথা বলছে, আমাদের নুলো মল্লিকের কথা বলছে, নুলো মল্লিকের যে আজকাল পাখা গজিয়েছে—

গুলমোহর আলি এতক্ষণ গাড়ির মাথায় চুপ করে বসে ছিল। এবার নেমে এল নিচেয়। বললে—হুজুর, এ আসলি ময়না আছে হুজুর—

দুর্লভবাবু এবার যেন সরে এল সামনে। বললে—দেখি রে, ভালো করে দেখি তোর পাখীটা?

বেদেটা পাখী নিয়ে দুর্লভবাবুর চোখের সামনে তুলে ধরলে।

দুর্লভবাবু বললে—ও-ধারটা একবার দেখা তো—

এ-ধার ও-ধার সব ধারই দেখানো হলো। দুর্লভবাবু অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বললে—না হুজুর, এ ময়নাই মনে হচ্ছে—

কর্তাবাবু বললেন—ভালো করে দেখে বলো দুর্লভ, নুলো মল্লিকের কাছে হেরে যাবো নাকি শেষকালে?

মুহুরিবাবু তখনও দেখছিল মন দিয়ে; বললে—আমারই ভুল হয়েছিল কর্তাবাবু, এ আসল ময়না—

—ঠিক বলছো তো।

দুর্লভবাবু বললে—হ্যাঁ হুজুর, আর কোনও সন্দেহ নেই, এ নির্ঘাৎ ময়না, এ আর দেখতে হবে না।

কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—মুলো মল্লিক কত দর দিয়েছিল ?

বেদেটা বললে—হুজুর, দেড়শো বলেছিল, আমি দিইনি—

ঠিক আছে, আমি তিনশো দেব, কিন্তু মুলো মল্লিককে গিয়ে বলে আসতে হবে, আমি তিনশো টাকায় ময়না কিনেছি—

দুর্লভবাবু বললে—হ্যাঁ, ওমনি ছাড়া হবে না, মুলো মল্লিককে শুনিয়ে দিতে হবে হুজুর, বড্ড পাখা গজিয়েছে আজকাল—

শেষ পর্যন্ত তো সেই পাখী কেনা হলো। পাখীর খাঁচা কেনা হলো। সেই তিনশো টাকার পাখী দেখতে এলো এ-বাড়িতে আরো দশটা পাড়ার লোক। পাখী দেখে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল চারদিকে। কিন্তু ধরা পড়ে গেল একদিন। পাখীটা যে শালিখ তা জানতে কারো বাকি রইল না। একদিন পাখীকে চান করাতে গিয়ে পায়ের রং ধুয়ে মুছে একাকার। চোখের কোণের হলদে দাগ, গায়ের কালো রং সব রং-করা। সব ফাঁকি ধরা পড়লো।

কর্তাবাবুদের এরকম গল্প আরো আছে। এ-বংশের গল্প, এই সংসার সেনের বংশধরদের গল্প এক কথায় বললে সব বলা হয় না। ওয়ারেন হেস্টিংস কি তারও আগে যে-বংশের পত্তন তার উত্থানের যেমন একটা ইতিহাস আছে তেমনি আছে পতনের ইতিহাসও। গুলমোহর আলির এখন কাজ কমে গেছে। এখন বড়বাবু কর্তাবাবুর মতো রোজ বেরোয়ও না, রোজ বেরোবার মতো মেজাজও নেই, স্বাস্থ্যও নেই। সকাল থেকে ঘুমিয়ে বসে খেয়ে সময় কেটে যায় গুলমোহর আলির। হঠাৎ মাসের মধ্যে হয়ত একদিন বলা-নেই কওয়া-নেই গাড়ি বেরোবার হুকুম হয়। বড়বাবুর খাস-বরদার পাঁচু এসে খবর দিয়ে যায়—বড়বাবু বেরোবে আজ গুলমোহর—

তা সেই বাদামী ঘোড়াটা মরে গেল শেষ পর্যন্ত। কর্তাবাবুর বড় পেয়ারের ঘোড়া ছিল সেটা। শেষকালে তার এলাইজও হলো না,

তদ্বিবৎও হলো না। আস্তাবলবাড়িতে দানা খেতে খেতে কাৎ হয়ে পড়লো। সেই থেকে গুলমোহরও যেন ভেঙে পড়েছে।

হঠাৎ সহিস আবদুল এসে বললে—চাচা, বড়বাবু নফরকে ডেকেছে—

নফরকে ডেকেছে! গুলমোহর শুয়েই ছিল, এবার উঠে বসলো। বললে—ডেকেছে নফরকে! ঠিক জানিস?

—হ্যাঁ চাচা, খাস-বরদার বললে যে!

গুলমোহর এবার সত্যিই উঠে দাঁড়ালো। নফরকে বড়বাবু ডেকেছে। এখন ঘোড়া তৈরি করতে হবে। জরির জামা বের করতে হবে। ঘোড়াকে ডলাই-মলাই করতে হবে। ঘোড়ার ল্যাজে আতর মাখাতে হবে, সাজ চড়াতে হবে। বেলঘরিয়া কি এখানে?

খাস-বরদার সিঁড়ির নিচে নামতেই মুহুরিবাবুর সঙ্গে দেখা। মুহুরিবাবু অনেক দিনের লোক। মুহুরিবাবু চাকদ' থেকে এসে কাজের চেষ্টায় একদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাঘুরি করেছিল। রাস্তার কলের জল খেয়েই কেটেছিল ক'টা দিন। তখন কর্তাবাবুই চেতলায় প্রথম ধানের কল করলেন। তাঁর দেখাদেখি গোয়ালটুলির মুলো মল্লিকের বাবা মাতাল মল্লিকও ধানের কল করতে গেল। কর্তাবাবুর ধানের কল থেকে দিনরাত চাল বেরোয়। সেই চাল চালান যায় এদেশে ওদেশে। জাভা, সুমাত্রা, ফিলিপাইন, মালয় আর চীনে। সব ভাত-খেগো দেশ।

কর্তাবাবু বলেছিলেন—গড়পড়তা মণ পিছু চার আনা রেখে সব ছেড়ে দাও—

ঐ চেতলার গঙ্গা থেকে হাজারমুণি নৌকো বোঝাই হয়ে সব চালান যেত চাল। ঘাটের ধারে বেগুনি-ফুলুরির দোকান বসে গেল সার-সার। কলের সামনে মণ্ডড়াদানীরা এসে সকালবেলা সেদ্ধ ধান সিমেন্টের উঠোনে শুকোতে দেয়। বিরাট উঠোন। এ মুড়ো থেকে ও-মুড়ো দেখা যায় না। তারপর সন্ধ্যেবেলা আবার ধানগুলো জড়ো করে করে ঢাকা

দিতে হয়। নইলে পায়রায় খেয়ে যাবে, হিম লাগবে। তারপরে সেই শুকনো ধান কলে চড়াতে হয়। ঘড় ঘড় করে কল চলে। সেই কলের শব্দে গদি-বাড়িটা কাঁপতো সারাক্ষণ। কর্তাবাবু আসতেন। ঘণ্টাখানেক দেখতেন, তারপর চলে যেতেন। কিন্তু সেই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কাজকর্ম কিছু দেখতে আর বাকি থাকতো না।

তা সেই কল মুহুরিবাবু হতেও দেখেছে আবার উঠতেও দেখেছে।

কর্তাবাবু সারাজীবন বাগানবাড়ি করে শেষজীবনটা বছর দেড়েক কাশীবাস করেছিলেন। ফিরে এসে আর বেশিদিন বাঁচেননি।

কালিদাসবাবু এখন খাজাঞ্চি। কল-বাড়ির খবর তিনি বিশেষ কিছু জানেন না। জানে মুহুরিবাবু। বলে—শেষ পর্যন্ত সেই শালিখ পাখীটার কী হলো শুনুন খাজাঞ্চিবাবু।

—আরে রাখো তোমার শালিখ পাখীর গল্প! এদিকে মরছি আমি হিসেবের জ্বালায়। তুমি তো খালি জমার হিসেব করেই খালাস, বকেয়া তো আমাকেই মিটোতে হবে—

তারপর খাতাটা সরিয়ে রেখে বলেন—হরিচরণ এক গ্লাস চা দে বাবা—

বাড়ির বাইরে রাস্তা। রাস্তাটা এখন গলির মতন। আগে এইটেই ছিল প্রধান রাস্তা। তখন লোকজন গাড়ি-ঘোড়া এই রাস্তা দিয়েই যেত। বড়বাবুর বিয়ের সময়ও এই রাস্তাটাই ছিল একমাত্র পথ। তা রাস্তা ছোট হলে কি হবে। একটা চায়ের দোকান আছে, একটা জামা-কাপড় ধোলাই-এর দোকান আছে। টপ্ করে বেরিয়ে গিয়ে এক মিনিটে চা আনা যায়। কালিদাসবাবু চা মুখে দিয়ে বলেন—এ কী চা করেছে রে হরিচরণ, চা খাচ্ছি না ছাই খাচ্ছি—

মুহুরিবাবু বলে—কর্তাবাবুর আমলে চা আমাদের কিনে খেতে হতো না খাজাঞ্চিবাবু—

কালিদাসবাবু থামিয়ে দেন। বলেন—তুমি থামো দিকিনি মুহুরিবাবু, কবে সোনা সপ্তা ছিল তার গল্প থাক্, এখন বকেয়া-বাকী খতেনটা দাও তো—

তারপর বলেন—গেলমাসে বড়বাবুর কত টাকা হাওলাত, দেখ তো হিসেবটা ?

মুহুরিবাবু হাওলাতের হিসেবটা দিয়ে সবে একটু কলে গিয়েছিল। ফেরবার পথেই খাস-বরদার পাঁচুর সঙ্গে দেখা। আর তারপরেই একেবারে হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে এসেছে।

—এদিকে সর্বনাশ হয়েছে খাজাঞ্চিবাবু!

—কি হলো? হাওলাত খাতা থেকে মুখ তুলে কালিদাসবাবু তাকালেন।

—বড়বাবু নফরকে স্মরণ করেছেন।

আবার নফরকে স্মরণ করেছেন! কালিদাসবাবু যেন খবরটা পেয়ে মুষড়ে পড়লেন। মাসের আজকে চব্বিশ তারিখ, পাওনা-গণ্ডা কিছু এখনও মেলেনি, এরই মধ্যে নফরকে স্মরণ করে বসলেন!

ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে শেষদিকে বার-বাড়ির দরোয়ানদের থাকবার ঘর। কিছু কিছু পুরোনো বাতিল খাতা-পত্র তাকের মাথায় জমা করা আছে। সাত-আট-দশ পুরুষের জমা-বকেয়ার খাতা, কত জমিদারি, কত ধান-কল আর নানা কারবারের হিসেব-নিকেশের খাতা-পত্র এখানে ওখানে সিন্দুকের মাথায় পড়ে আছে। বছরের পর বছর ধরে ধুলো জমছে তার ওপর। দরোয়ানেরা সকালে ওঠে ঘুম থেকে, দুপুরবেলা ঘুমোয় আবার রাত্রে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ে। তারা জানতেও পারে না কতপুরুষ ধরে যে হিসেব-নিকেশ তাদের মাথার ওপর ধুলো জমে জমে এখন পচে খসে যাচ্ছে, সে হিসেব-নিকেশ অনেক কষ্টের আর অনেক যত্নের ধন ছিল একদিন। অনেক পুরুষের পাপের আর পরিশ্রান্তির সব

ফসল সেগুলো। সে-ফসল একদিনে সঞ্চিত হয়নি। দিনে রাতে নিরলস বিলাস, বিভ্রম আর বিতৃষ্ণার সব সঞ্চয়। কেউ বুঝতে পারে না কেউ চিনতে পারে না তা! কেউ জানতেও পারে না সে-সব।

শুধু একজন জানে।

মা-মণি বলেন—বৌমা?

বৌমা এ-বাড়ির বড়বাবুর বৌ, তাঁর যেন সব দেখা শোনা বোঝা হয়ে গেছে। রাত যখন গভীর হয়, বড়রাস্তার ট্রামের বাসের শব্দ ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে, তখনও ঘুম আসে না তাঁর। বলেন—সৌরভী, দেখে আয়তো জগত্তারণবাবু কি চলে গেছেন না আছেন?

জগত্তারণবাবু কর্তাবাবুর আমলের লোক। অ্যাটর্নীর অফিসে চাকরি করেন দিনের বেলা। কিন্তু বড়বাবু তাঁকে স্মরণ করেন প্রায়ই। গাড়ি পাঠিয়ে দেন। জগত্তারণবাবু জামা-কাপড় বদলে পাঞ্জাবিতে আতর মেখে এসে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসেন। আগে রোজই আসতেন। রোজ। গুলমোহর আলির একটা বাঁধা কাজই ছিল ওটা, সোজা গাড়ি যেত কম্বলিটোলায়। সেখানে যতক্ষণ না জগত্তারণবাবু জামা-কাপড়-সাজ-পোশাক প'রে তৈরি হতেন ততক্ষণ গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতো। তারপরে নিজের খেয়ালমতো টগ্‌বগ্‌ করতে করতে আসতেন।

এখন বড়বাবুর কাছেও আসেন।

এসেই বলেন—আজকে আর একজন কাৎ—বুঝলে হে বড়বাবু, আর এক মক্কেল কাৎ হলো।

বড়বাবু তাকিয়ায় হেলান দিলেন।

বললেন—আবার কোন্ মক্কেল কাৎ হলো মাস্টার?

রোজ হাইকোর্ট অঞ্চলে ঘোরা-ফেরা করেন। টাট্‌কা খবরটা তিনি পান। মক্কেল কাৎ হওয়ার খবরে ভারি খুশী হন জগত্তারণবাবু। যেদিন

কোনও মক্কেল কাৎ হয় না সেদিন ভারি বিমর্ষ থাকেন। কিন্তু আবার কোনও মক্কেলের কাৎ হওয়ার খবর পেলেই শুনিয়ে যান। মোষের শিং-এর পাখীর ঠোঁট মার্কা হ্যাণ্ডেলওয়ালা পাকানো একটা ছড়ি হাতে। এসেই বলেন—মা-জননী কেমন আছেন বড়বাবু?

বড়বাবু বলেন—ভালো।

—যাক্, ভালো থাকলেই ভালো বড়বাবু, ওঁরা সব পুণ্যাত্মা লোক বড়বাবু, ওঁরা বেঁচে থাকলেও পৃথিবীটা তবু কিছু হালকা থাকে, নইলে পাপ যে-রকম বাড়ছে।—কিন্তু আজকের খবর শুনেছেন?

বড়বাবু বললেন—কী খবর?

—শোনেননি? আরে আজকে হাইকোর্ট পাড়ায় যে হৈ-চৈ পড়ে গেছে, সেই মাতাল মল্লিকের নাতি, মুলো মল্লিকের ছেলে কার্তিক মল্লিক কাৎ—

—কেন?

জগত্তারণবাবু বলেন—হুণ্ডি কেটেছিল কাবলিয়ালার কাছে, এখন সুদে-আসলে সব ডিক্রি হয়ে গেল, আর মাথা তুলতে হবে না বাবাজীকে এবার—

একটা-না-একটা কাপ্তেন রোজ ঘায়েল হয় কলকাতায়, আর জগত্তারণবাবু তার দীর্ঘ ফিরিস্তি দেন বড়বাবুর কাছে এসে। আগে রোজ আসতেন, এখন বড়বাবুর রক্তের তেজ কমে এসেছে, একটা-না-একটা অসুখে কাবু হয়ে থাকেন। এসেও তেমন জমে না। একলা আর কতক্ষণ জমিয়ে রাখেন।

যাবার সময় বলেন—কই বড়বাবু, অনেকদিন তো কিছু হয়নি, শেষে কি শুক্রাচার্য হয়ে যাবে নাকি?

বড়বাবু তাকিয়া থেকে উঠে বলেন—না, কই, এতদিন তো মনে ছিল না মাস্টার, মনে করিয়ে দিতে হয় তো—

—হ্যাঁ, তাহলে কালকেই হয়ে যাক্—খুব দাঁওয়ে কিছু হুইস্কি পাওয়া যাচ্ছিল, ফস্কে গেল—

বাড়ি ফেরার আগে জগত্তারণবাবু বার-বাড়ির সামনে একবার এসে দাঁড়ান। উঠোনে বাল্ববাতিটা তখনও জ্বলছে টিমটিম করে। দরোয়ানদের সদরে ভূষণ সিং ছাতু খাচ্ছিল। জগত্তারণবাবু সামনে গিয়ে বললেন—এই যে ভূষণ, একবার যে বাবা ভেতরে খবর পাঠাতে হবে, মা-জননীর পায়ের ধুলো নেব—

ভূষণ সিং সোজা মা-জননীর কাছে যেতে পারবে না, সে খবর দেবে পয়মন্তকে। পয়মন্ত বার-বাড়ির চাকর, সে খবর পাঠাবে ভেতর বাড়ির সিন্ধুকে। সিন্ধু মা-জননীকে বলবে—মাস্টারবাবু একবার পায়ের ধুলো নিতে এসেছেন মা-মণি।

তারপর জগত্তারণবাবু পয়মন্তর সঙ্গে গিয়ে অন্দরের সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াবেন। ওপর থেকে সিন্ধু ঘোমটা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেই জগত্তারণবাবু ওপর দিকে চেয়ে বললেন—মা-জননী, আপনার ছেলে এসেছে, ক'দিন আসতে পারিনি, অপরাধ নেবেন না আমার—

সিন্ধু মা-মণির বকলমায় বলবে—খোকাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন মাস্টারবাবু—

—আজ্ঞে আমাকে আর বলতে হবে না মা-জননী, আমি তো তাই বোঝাতেই রোজ আসি, বলি তো যে ও-সব ছাইভস্ম খাওয়া কি ভালো? বুঝেছে, আগের থেকে অনেক বুঝেছে মা-জননী, দেখেন না আমি বুঝিয়ে-বুঝিয়ে কত ঠাণ্ডা করেছি—

সিন্ধু বলবে—আজকে কেমন আছে খোকা?

—আজকে তো মেজাজ ভালোই দেখলাম মা-জননী, গীতাখানা পড়ালাম আজ, চতুর্দশ অধ্যায়টা শেষ করে দিলাম, ও-সব বদ্ চিন্তা-টিন্তা যাতে না আসে আর কি! তবে একটু সময় লাগবে, অনেক দিনের

নেশা তো, সইয়ে সইয়ে ছাড়াবো, তা আমি যখন আছি আপনি তখন কিছু ভাববেন না—এখন আমার হাতযশ আর আপনার আশীর্বাদ—

সিন্ধু বললে—আমার এক ছেলে, আপনিই ওর মাস্টার ছিলেন, আপনিই ভরসা আমার—

জগত্তারণবাবু বলবে—আমার ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকুন মা-জননী, আপনার একটু পায়ের ধুলো পেলে আমি আর কাউকে ভয় করি না—একটু পায়ের ধুলো দিন মা-জননী, বাড়ী চলে যাই।

সিন্ধু একটা ছোট রূপোর বাটিতে খানিকটা পায়ের ধুলো নিয়ে এসে সামনে ধরে আর জগত্তারণবাবু সব ধুলোটুকু মাথায় ঠেকিয়ে বাটিটা একবার জিভে ঠেকান। তারপর সেই সেখানে দাঁড়িয়েই সিঁড়ির সিমেণ্টের ওপর কপাল ঠেকিয়ে বাড়ি চলে যান।

এ-ঘটনা বহুদিনের, বহু বছরের। বহু বছর ধরেই জগত্তারণবাবুর এমন মা-জননীর পায়ের ধুলো-প্রাপ্তি ঘটে আসছে। পায়ের ধুলোর জোরেই জগত্তারণবাবুর নিজস্ব বাড়ি হয়েছে কম্বলিটোলায়, নিজস্ব মোটরগাড়ি হয়েছে। সেই গাড়ি করেই নিজের অফিসে যান। কিন্তু বড়বাবুর কাছে আসতে হলেই বড়বাবুর গাড়ি নিয়ে যায় গুলমোহর।

আগের দিন রাত্রেও এসেছিলেন জগত্তারণবাবু। যথারীতি মক্কেল কাৎ হওয়ার গল্পও করেছেন বড়বাবুর ঘরে বসে, তারপর যথারীতি মা-জননীর পায়ের ধুলো নিয়ে কপাল ঠেকিয়ে প্রণামও করে গেছেন। তখনও কেউ টের পায়নি যে পরদিন ভোরবেলাই নফরের ডাক পড়বে। নফর নিজেও কল্পনা করতে পারেনি।

খাস-বরদার পাঁচু বাড়-বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই একেবারে সামনা-সামনি ধাক্কা লাগছিল ভূষণ সিং-এর সঙ্গে। ভূষণ সিং বহুদিনের লোক। কর্তাবাবুর আমলে বন্দুক নিয়ে পাহারা দিত। সে বন্দুক এখন নেই, তাই সে তেজও নেই। মানুষটাও বুড়ো হয়ে গেছে। একতাল আটা

নিয়ে যাচ্ছিল মাখতে। আর একটু হলেই ধাক্কা লেগে আটাও নষ্ট হতো, থালাও ভাঙতো। খাস-বরদার মুর্গী ছোঁয়, মচ্‌লি ছোঁয়—

—অন্ধা হ্যায়, না কেয়া হ্যায় ?

আর দু'একটা চড়া কথা বললেই হাতাহাতি বেধে যেত সেখানে। এমন বেধেছে অনেকবার। ভূষণ সিং-এর সে-তেজ নেই বটে, কিন্তু রাগটা আছে। রাগ করলে আর জ্ঞান থাকে না তার।

—থাম্ তুই, ভারি রাগ দেখাচ্ছে আমাকে !

কর্তাবাবু পর্যন্ত সে-আমলে ভূষণ সিংকে সামলে নিয়ে চলতেন। বলতেন—ওকে চটিয়ো না তোমরা হে, ও খাস মৈথিলী ব্রাহ্মণ, ওদের রাগটা একটু বেশি হয়। আর সদর গেট্-এ রাগী লোক থাকা ভালো—

—তুই রাগ করে তো আমার কচু করবি—ব'লে বুড়ো আঙুল উচিয়ে দেখায় পাচু। হয়ত আটাসুদ্ধ পেতলের থালাটা পাচুর মুখে ছুঁড়েই মারতো ভূষণ সিং। ছুঁড়ে মারলে আর রক্ষে থাকতো না পাচুর। ওখানেই অজ্ঞান হয়ে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড বেধে যেত। আর নফরকে ডাকতে যাওয়া হতো না!

—অন্ধা হ্যায় না কেয়া হ্যায় ?

—থাম্ তুই, এখন কথা বলবার সময় নেই আমার, বড়বাবু নফরকে ডেকেছে—নইলে দেখে নিতুম—

নফরকে ডেকেছে! অমন যে রাগী মৈথিলী ব্রাহ্মণ ভূষণ সিং, সেও যেন খবরটা শুনে কেমন থমকে দাঁড়াল।

রান্নাবাড়িতে সকাল থেকেই গোলমাল থাকে। গোলমাল সব সময়েই থাকে সেখানে। রান্নার কালি-ঝুল আর ধোঁয়ার মধ্যে যে-মানুষগুলোর জীবন এতদিন কেটেছে, তারা জানতে পারে না কখন কোন্ দিকে সূর্য উঠলো, কখন ডুবলো। বড়বাবুর খাবারের রকমারি চাই। খাজাঞ্চিমশাই বাজারের সরকারও বটে। বাজার-খরচটা তাঁর হাত দিয়ে

হবে। কালিদাসবাবু বাজারে গেলেই বাজারের মেছুনি থেকে শুরু করে আলু-পটলওয়ালারা ডেকে ওঠে—এই যে বাবু, এদিকে আসুন—আজকে ধলেশ্বরীর লালচক্ষু রুই—

আলুওলা বলে—নৈনিতাল আলু ছিল বড়বাবু, আধমণ নিয়ে যান্—

সেই বাজার কিছু যাবে নিজের বাড়ি, কিছু আসবে এ-বাড়িতে। তারপর ভাঁড়ারের ঝি'রা সেই আনাজ তরকারি কুটতে বসবে। মা-মণির জন্যে বড়-বড় আলু কুটতে হবে। বো-মণির আলু-ছেঁচকি। আর বড়-বাবুর কুচো-কুচো আলুভাজা। ডাল হোক না-হোক, ঝোল হোক না-হোক, ডালনা হোক না-হোক—আলুভাজা চাই-ই বড়বাবুর।

খেতে বসে বড়বাবু বলেন—আর চারটি আলুভাজা দিতে বল্ তো পেঁচো—

খাস-বরদার পাঁচু ছুটে যায় রান্নাবাড়িতে। রান্নাবাড়ি কি এখানে! বার-বাড়ির উঠোনে মস্ত একটা নিমগাছ। সেই নিমগাছ ঘুরে খিড়কী দিয়ে অন্দরের রান্নাঘরের দরজা। দৌড়তে দৌড়তে সেখানে গিয়ে পাঁচু দূর থেকে হাঁকায়।

বলে—ও শিশুর-মা, আলুভাজা চাইছে বড়বাবু, আলুভাজা দাও—

মঙ্গলা তখন উনুনে চচ্চড়ি চড়িয়েছে। নটে শাক, কুমড়ো আর আলুর খোসা দিয়ে মা-জননীর শখের তরকারি হচ্ছিল। ভাজা বড়ির গুঁড়োও দিতে হবে শেষে। সরষে বাটিয়ে রেখেছে শিশুর-মাকে দিয়ে। সকালবেলা ফরমাশ হয়েছে, সিন্ধু এসে রান্নাবাড়িতে ফরমাশ দিয়ে গেছে। এখন বেলা হতে চললো, চচ্চড়ি এখনও নামলো না।

মঙ্গলা বলে—হ্যাঁ শিশুর-মা, খাজাঞ্চিখানার লোক এখনও খেতে এলো না?

প্রথমে খাজাঞ্চিখানার লোক খাবে। তিনজন খায় রোয়াকে বসে।

শিশুর-মা তাদের পরিবেশন করে। তারপর বার-বাড়ির মানুষ-জন যারা দু'একদিনের জন্য আসে বাড়িতে তারা খাবে। কল থেকে ম্যানেজারবাবু আসে বেলা বারোটার সময়। তাঁকে খেতে দিতে হবে। দফে দফে রান্না যেমন, তেমনি দফে দফে খাওয়া। মা-মণি, বৌ-মণি যা খাবে তা সিন্ধু এসে থালা সাজিয়ে নিয়ে যাবে দোতলায়। তারপর সকলের শেষে খাবে বড়বাবু।

—হ্যাঁরে, বড়বাবু কি চান করতে নেমেছে ?

খবর আসে বড়বাবু তেল মাখতে নেমেছে। দাড়ি কামানো, তেল মাখা, গা টেপা তাইতেই বেলা পড়ে যাবার ব্যাপার। মঙ্গলাকে ততক্ষণ বসে থাকতে হয়। বড়বাবু না খেলে মঙ্গলাও খেতে পারে না। ক্ষিদে অবশ্য পায় কি পায় না তা বোঝবার ফুরসুত থাকে না। শিশুর-মা যোগান দেয় আর মঙ্গলা রাঁধে।

—হ্যাঁরে, নফর আজ কই খেলে না তো!

শিশুর-মা বলে—পারিনে বাপু ডেকে ডেকে ভূত খাওয়াতে, যার গরজ হবে সে এসে খেয়ে যাক্ না!

—আহা ছাখ্ না, ছেলেটা না খেয়ে থাকবে গা!

এক এক দিন খেতেই আসে না, লোক পাঠিয়ে ডাকলে তার খোঁজ পাওয়া যায় না। এ-বাড়ির প্রত্যেকটি লোকের কাজ আছে। ওই খাজাঞ্চিবাবু থেকে শুরু করে চাক্‌দ'র মুহুরিবাবু, ভূষণ সিং, ফুলমণি, সিন্ধু, মা-মণি, বৌ-মণি, হরি-জমাদার, সকলে সকাল থেকে চরকির মতো ঘোরে। কাজটা যে কে কী করে তার হিসেব দেওয়া সহজ নয়, কিন্তু ব্যস্ত সবাই। সকাল থেকেই কেন, ভোর রাত থাকতে উনুনে আগুন পড়ে রান্নাবাড়িতে। তখনও কেউ ওঠেনি। মঙ্গলার তখন চান হয়ে গেছে উঠোনের কলতলায়। বিধবা মানুষ, জপ বলো আহ্নিক বলো সব সেই সময়ের মধ্যে করতে হয়। তার চেয়ে সে-সময়টাতে আলুভাজা,

চচ্চড়ির কথা ভাবলে বেশি লাভ। সারা বাড়ির লোক খাচ্ছে, কিন্তু রাঁধছে যে কে তার হিসেব কেউ রাখে না।

শিশুর-মা বাটনা বাটতে বাটতে বলে—দিদি, অম্বুবাচী কবে গো?

কে জানে কার অম্বুবাচী। কবে অম্বুবাচী, কবে সূর্যগ্রহণ, কবে পূর্ণিমা, কবেই বা একাদশী কোনও খবর রাখবার সময় থাকে না রান্নাঘরের মধ্যে। চারটে উনুন। হাঁ-হাঁ করে জ্বলছে রাবণ-রাজার চিতার মতো। চিতা যেন আর নিভতে চায় না। কবে সংসার সেনের আমলে এই চিতা জ্বলতে শুরু হয়েছে, তার যেন আর ক্ষান্তি নেই। একটা উনুনে ভাত চাপিয়ে আর একটা উনুনে ডাল চাপাতে হয়। ততক্ষণে আর একটা উনুন হু-হু করে জ্বলছে। সেটাতেও ভাত চাপাতে হয়। এক মণ চালের ভাত চড়ে রোজ। এক হাঁড়ি ভাত নামলো তো আর এক হাঁড়ি চড়িয়ে দাও। দশ রকম চাল। চালের কম-বেশ আছে। বাইরের লোক খাবে মোটা লাল চাল। বৌ-মণি মা-মণি খাবে সরু আতপ চাল। বড়বাবু খাবে বাসমতী সেদ্ধ চাল। ডালও একরকম নয়। কেউ মুগ, কেউ মুসুর, কেউ বিউলি, কেউ খেসারি। রকমারি লোকের রকমারি খাওয়া।

খেতে বসে মুহুরিবাবু বলে—বড়ির ঘণ্ট আর-একটু শিশুর-মা!

মঙ্গলা বলে—বড়ির ঘণ্টটা এই রেখে দিলাম বাটি ঢাকা দিয়ে, নিস্‌নে যেন, নফর খাবে—

—মুহুরিবাবু চাইছে যে!

—তা চাইছে বলে কি আর কেউ খাবে না! আমার দুধ পুড়ে গেল, আমি তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে পারিনে বাপু—

রোজ সকাল থেকে নানান লোকের চাহিদা মেটাতে-মেটাতেই হিমসিম খেয়ে যায় মঙ্গলা আর শিশুর-মা। এর মধ্যে ওপর থেকে ফরমাশ আসে—ডালে আজ নুন কম হয়েছে শিশুর-মা—

কেউ বলে—কালিয়াতে আজ এত লঙ্কা দিলে কেন গা ?

সব খবর পৌঁছোয় না রান্নাবাড়িতে। ফ্যান গালতে-গালতে হাতটা পুড়ে যায় কতবার। শিশুর-মা বলে—ওমা, হাতে তোমার ফোস্কা কেন দিদি ?

মঙ্গলা টেরও পায়নি। বলে—ওমা, তাই তো—

—একটু চুন আর নারকোল তেল দিয়ে দেব ?

চুন নারকোল-তেল দেবার সময় নেই সেন-বাড়ির রান্নাবাড়িতে। ভোরবেলা উঠে উনুনে রান্না চাপাবার পর সেই যে একটার পর একটা কাজের চাপ আসে, তারপর থেকে রাত বারোটা অবধি নিশ্বাস নেবার ফুরসুত থাকে না মঙ্গলার।

শিশুর-মা দু'একটা খবর এসে দিয়ে যায় বটে, বলে—শুনেছ দিদি, ভেতর-বাড়ির সিন্ধুর কাণ্ড ?

মঙ্গলা তখন ডালে ফোড়ন দিচ্ছে। বলে—কথা রাখ্, বাছা, তোর বাটনা হলো ? আমার এদিকে কয়লা পুড়ে গেল—

শিশুর-মা বলে—ঝি-গিরি করছি বলে তো জীবন বিকিয়ে দিইনি দিদি, ঘেন্না ধরে গেল মাগীর কাণ্ড দেখে—

তবু মঙ্গলা কোনও কথা কানে নেয় না।

বলে—মা-মণির অসুখ হয়েছিল, কেমন আছেরে জানিস্ ?

শিশুর-মা বলে—আজ তো বড় কবিরাজ এসেছিল, গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল দেউড়িতে—

মঙ্গলা বলে—একবার সময়ও পাইনা যে দেখা করে আসি—

—কদ্দিন কাজ হোল তোমার দিদি ?

কাজ কি আজকের ! কত বছর হবে ? যেবার কর্তাবাবু কাশী গিয়েছিল তীর্থ করতে, সেইবারই প্রথম এ-বাড়িতে ঢোকে মঙ্গলা। ওই নিমগাছটা তখন ছোট ছিল। হাত দিয়ে ডাল ছোঁয়া যেত।

কতদিন ওরই ডাল ভেঙে দাঁতন করেছে বাড়ির ঝিউড়িরা। ওইখানে তখন মাটি ছিল। মাটির কোণে দুটো লাউগাছ ছিল। সেই লাউডগা উঠেছিল রান্নাবাড়ির ছাদে। লাউ হয়েছিল প্রথম-প্রথম। কিন্তু হনুমান এসে সব মুড়িয়ে খেয়ে গেল একদিন। শিশুর-মা তখনও আসেনি। আর নফর তখন ছোট। ফরসা ফুটফুটে চেহারা।

লোকে জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ রে, তোর মা কে? বাবা কে?

মুহুরিবাবু তখন খাজাঞ্চিখানায় কাজ করছে। বলতো—অ্যাই ছোঁড়া, নাচতো দেখি, নাচ্—

কালিদাসবাবু সরকারি কাজ থেকে মুখ তুলে বলতেন—আবার ওকে ক্ষেপাচ্ছ কেন বলো দিকিন্—

কিন্তু নফর তখন নাচতে শুরু করে দিয়েছে। নাচ মানে তেমনি নাচ। ধেই ধেই করে নাচ।

—এইবার গান গা তো?

কালিদাসবাবু বলতেন—আবার কাজের সময় গান করতে বলছো কেন বল তো!

নফর ততক্ষণে নাচ থামিয়ে গান ধরে দিয়েছে—

আমি বৃন্দা-
বনে বনে বনে
বাঁশী বাজাবো—
আমি বৃন্দা—

—থাম বাপু, তোর গান থামা—তোর বাপ কে রে? কাদের ছেলে তুই?

—সরকার মশাই, ওর ডিগবাজি খাওয়া দেখবেন? অ্যাই, ডিগবাজি খা তো?

নফরকে বলতে হয়না বেশি। হুকুম তামিল করতে পারলেই খুশী।

শেষকালে সামনে এসে হাত পাতে বলে—একটা পয়সা দাওনা সরকারবাবু—

কালিদাসবাবু এক ধমক দেন বলেন—দূর, দূর হ, পয়সা কেন রে, পয়সা কী হবে ?

—ল্যাবেনচুষ খাবো।

—দূর হ, বেরো এখান থেকে, পরনে কানি নেই, ল্যাবেনচুষ খাবেন ! যা, বেরো এখান থেকে !

বের করে তাড়িয়ে দিত বটে সরকার-গমস্তারা। তখন ছোট। কেউ বলুক না কিছু, দিক না তাড়িয়ে, কিছু আসে যায় না তাতে নফরের। আবার গিয়ে দাঁড়াত দরোয়ানদের ঘরে। ভূষণ সিং তখন ডন্-বঠকী দিচ্ছে আর হুম্ হুম্ শব্দ করছে। সেখানে গিয়েও দাঁড়াতো খানিকক্ষণ। তারপর বলতো—আমিও পারি ও-রকম, দেখবে ? দেখবে তোমরা ?

ন্যাংটো হয়ে সেই অবস্থাতেই লেগে যেত ডন্-বৈঠক করতে। হতো না ঠিক। তবু করতো। ফুলমণি দেখতে পেয়ে বলতো—হ্যাঁরে, তোর কাপড় কী হলো ? ন্যাংটো হয়ে ঘুরছিস্ কেন ?

কাপড় কি কোমরে থাকতো তখন নফরের ! ধরে বেঁধে কেউ একটা ছেঁড়া কানি পরিয়ে দিলে তো তাই নিয়ে এ-পাড়া ও-পাড়া রাস্তায়-ঘাটে ঘুরে বেড়াতো। কর্তাবাবু যখন বেরোতেন, সঙ্গে জগত্তারণবাবু, দুলালহরিবাবুও যেতেন। নফর সামনে গিয়ে হাজির। কর্তাবাবু দেখলে বলতেন—হ্যাঁরে, এটাকে একটা কাপড় পরিয়ে দেয় না কেন কেউ ?

জগত্তারণবাবু একবার দেখে বললেন—ছেলেটা কাদের কর্তাবাবু ?

দুলালহরিবাবু বলতেন—ক'দিন থেকে দেখছি, কোত্থেকে এল ?

—এই, তোর নাম কী রে ?

—একটা পয়সা দাওনা।

—এইটুকু ছেলে আবার পয়সা চায় যে! পয়সা কী করবি?

—ল্যাবেনচুষ খাবো, ওই মোড়ের দোকান থেকে।

তখন কর্তাবাবুর রমারম অবস্থা। সংসার সেনের বংশের কুলতিলক। চেতলায় ধানের কল করেছেন। পোস্তায় সোরার কারবার, বেলেঘাটায় তেল-কল। সব কারবারই ভালো চলছে। হুড় হুড় করে টাকাও আসছে। টাকার যেন বৃষ্টি হয়। লাখ-লাখ টাকা জমা হয় খাজাঞ্চি-খানায়, খাতা লিখতে লিখতে হাত ব্যথা করে মুহুরিবাবুর। বকেয়ার খাতায় তেমন কালির আঁচড় পড়ে না, জমার খাতায় চারটা-পাঁচটা অঙ্কর ধাক্কা সামলানো দায় হয়ে ওঠে। রাত আটটা ন'টা বেজে যায় সরকার-মুহুরির সেই ঠেলা সামলাতে। কর্তাবাবুর মোসায়েবের দলও বাড়ে। বাবুরা বলেন—আজকে নৌকাবিলাস হোক কর্তাবাবু, অনেকদিন নৌকাবিলাস হয়নি—

তা তা-ই হয়।

বাবুরা বলেন—অনেকদিন ভালো গান শুনিনি কর্তাবাবু, মোহরবাঈ কলকাতায় এসেছে শুনেছি—

তা তা-ই হয়।

বাবুরা বলেন—মুলো মল্লিক একজোড়া সাদা ওয়েলার কিনেছে দেখলুম, বেশ দেখাচ্ছিল কিন্তু—

তা তা-ই হয়।

নৌকাবিলাস হয়, মোহরবাঈজীর গান হয়, সাদা ওয়েলার একজোড়া, তা-ও হয়। কোনও শখ অপূর্ণ থাকে না কর্তাবাবুর বাবুদের। কোথাও ভালো পাটনাই গাই-গরু এসেছে শুনলে, তাই-ই কেনা হয়।

কর্তাবাবুর শোবার ঘরে মা-মণি একদিন এলেন।

বললেন—গুরুদেব এসেছেন, জানো!

—কই জানি না তো! কেউ বলেনি তো আমাকে!

মা-মণি বলেন—গুরুদেব বলছিলেন চূড়ামণি-যোগে তীর্থভ্রমণে নাকি সব পাপ ক্ষয় হয়, যাবে !

—পাপ !

পাপ যে কোথায় তা তো জানা ছিল না কর্তাবাবুর। পাপ তো কিছু করেন না। কারোর কোনও ক্ষতি তো করেন না তিনি। কারো চোখের জল ফেলেন না। যে আশ্রিত হয়ে থাকে তাকে খেতে দেন। কেউ হলপ করে বলতে পারবে না সংসার সেনের বাড়িতে এসে অপমান পেয়ে ফিরে গেছে। দান-ধ্যানও আছে কর্তাবাবুর। পুরী থেকে পাণ্ডারা এলে দক্ষিণে নিয়ে হাসিমুখেই আবার চলে যায়। নিত্য দেবসেবা আছে বাড়িতে—সেখানেও ভোগ হয়, প্রসাদ বিলোনো হয়। পুজোর সময় যে-সে কাপড় পায়। পাত পেতে খেয়ে যায় সবাই। সরকারের খাতায় তার হিসেব আছে দস্তুরমতো। তারপর ওখানে দুর্ভিক্ষ, এখানে অজন্মা, সব চাঁদা দেন কর্তাবাবু। কাউকে ফেরান না তিনি। তবে আর পাপ কিসের ?

মা-মণি বললেন—বলছো কি তুমি, পাপ নেই ? বেঁচে থাকাই তো পাপ, কত পাপ-ই যে করেছি—

তা ঠিক হলো তীর্থবাসই করতে হবে। তীর্থবাস! গুরুদেব বোঝালেন—ব্রাহ্মণকে দান করলে এক জন্মের পাপ ক্ষয় হয়, কিন্তু সস্ত্রীক তীর্থবাস করলে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ক্ষয় হয়। আর সত্যিই তো, বেঁচে থেকেই তো আমরা অসংখ্য পাপ করছি। মনের অগোচরে কত হত্যা করছি, কত মিথ্যাচার করছি, কত অসদাচরণ করছি।

গুরুদেব সোয়া পাঁচশো টাকার প্রণামী আর কাপড়, বাসন, খড়ম ইত্যাদি নানা জিনিসপত্র নিয়ে উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। তিনি কাশীধামে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে রাখবেন। এদিকে তোড়জোড় হতে লাগলো।

জগত্তারণবাবু তখন অ্যাটর্নীশিপ পড়ছেন। বললেন—অব্যেস খারাপ হয়ে গেছে কর্তাবাবু, সময় কাটতে চাইবে না—

কর্তাবাবু বললেন—তোমরাও চলো না—

দুলালহরিবাবু বললেন—আমরা চললে এদিকে সামলাবে কে ?

বাগানবাড়িতে কর্তাবাবুর মেয়েমানুষের তখন খুব খাতির। পুতুলমালার মা আছে, পুতুলমালার ঝি আছে, পুতুলমালার চাকর, দরোয়ান সব আছে। কিন্তু তবু ভয় যায় না। ন্যুলো মল্লিক নতুন বড়লোক। কোত্থেকে কী করে বসে, পুতুলমালার মাকে খুশী করে হয়ত হাত করে নেবে, তখন এ-কুল ও-কুল উভয়কুল যাবে। তার চেয়ে জগত্তারণবাবু থাক্। দুলালহরিবাবু থাক্। দু'বেলা দু'জন পালা করে পাহারা দেবে।

কর্তাবাবু বললেন—জগত্তারণ তুমি যেয়ো সন্ধ্যাবেলা, আর দুলালহরির তো কোনও কাজ নেই, ও যাবে'খন সকালবেলার দিকটা,—কড়া নজর রাখবে যেন বাইরের মাছিটি না মাড়ায় ওখানে—

কিন্তু সেই-যে কর্তাবাবু কাশী গেলেন, সেই যাওয়াতেই কপাল ভাঙলো মঙ্গলার।

মঙ্গলা তখনও এ-বাড়িতে আসেনি। এ-বাড়িতে কর্তাবাবু কাশীধামে যাবেন, তারই তোড়জোড় হচ্ছে। কে সঙ্গে যাবে, কে যাবে না। কী-কী যাবে, কখন যাবে, অনেক ঝঞ্ঝাট। দু'মাস ধরে তার বিলি-বন্দোবস্ত হলো। এ-সব অনেক দিন আগের কথা। তখন ভূষণ সিং-এর বয়েস কম ছিল। কালিদাসবাবুর যৌবন ছিল, মুহুরিবাবুর তখনও চুল পাকেনি। জগত্তারণবাবু তখনও অ্যাটর্নীশিপ পাস করেননি। আর এখনও তো দুলালহরিবাবুই নেই। একদিন হঠাৎ কর্তাবাবুর বাগানবাড়ির পুকুরে পাওয়া গেল দুলালহরিবাবুর দেহখানা। ফুলে-কেঁপে তখন ঢোল হয়ে গেছে। থানা-পুলিশ যা-হবার হলো। কর্তাবাবুর কাছে চিঠি গেল

কাশীধামে। কিন্তু সে-চিঠির উত্তর আর এল না। মা-মণির তখন খুব অসুখ।

বাড়িতে খবর এসে গেছে কর্তাবাবু অস্থির হয়েছেন কলকাতায় আসবার জন্যে, কিন্তু মা-মণির জন্যে আসবার উপায় নেই। সঙ্গে সরকার গেছে, খাস-বরদার পীরজাদা দরোয়ান গেছে, কুঞ্জবালা গেছে। আর গেছে মঙ্গলা।

মঙ্গলাকে কে যেন এনে দিয়েছিল এ-বাড়িতে। কর্তাবাবু কাশীধামে যাবেন তীর্থ করতে। তাই একটা লোক চাই রান্না-বান্না করতে। বামুনের মেয়ে হবে, খাটবে-খুটবে বেশি, মুখে কথাটি বলবে না।

মা-মণি আপাদমস্তক দেখলেন। বললেন—তুই কাজ করতে পারবি?

—কাজ না করলে খাবো কি মা, বিধবা মানুষকে কে বসিয়ে-বসিয়ে খাওয়াবে।

—বলি রান্না-বান্নার কাজ করেছিস কখনও?

—করবার তো দরকার হয়নি মা, এখন থেকে করবো।

কত আর বয়েস তখন। তেরো কি চোদ্দ। ওই বয়েসেই কপাল পুড়েছে। রূপ নয় তো, আগুন বললেই যেন ভালো হয়।

মা-মণি বললেন—তোর দ্বারা হবে না বাপু আমার কাজ, এত রূপ, সব ছারখার করে দিবি, এই পাঁচটা টাকা নিয়ে বিদেয় হও বাপু, অন্য জায়গায় ছাখো—

মঙ্গলা মা-মণির পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছিল। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল—মুখখানা আমার পুড়িয়ে তুমি কালো করে দাও মা, তা-ও আমি সইতে পারবো, কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা মা—

—তাই যদি এত জ্বালা তো গঙ্গায় ডুবতে পারো না বাছা? গঙ্গায় তো জলের অভাব নেই!

—তাই-ই যদি পারবো তো তোমার পায়ে ধরছি কেন মা।

তখনকার ঝি ছিল কুঞ্জবালা। কুঞ্জ মারা গেছে পরে।

সে বলেছিল— কর্তাবাবুর সামনে বেরোসনি হারামজাদী, সামনে যদি বেরোস্ তো তোর শিরদাঁড়া আস্ত ভেঙে দেবো—

তা তাই-ই ঠিক হলো। কাজ করবে মুখ বুঁজে। দিনরাত কাজ করতে ব্যাজার হবে না, এমন লোকই দরকার। কুঞ্জবালা বললে—থাক্ মা, কর্তাবাবুর সামনে ওকে আড়াল করে রাখবো আমি—

কুঞ্জবালার সঙ্গে একদিন মঙ্গলা ফরসা থান কাপড় পরে ঘোমটা দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে উঠলো। আগে যাবে ঝি-ঝিউড়িরা। চাকর-বাকররা। সরকার-গমস্তারা। তারা বাসা ঠিক করে সব বন্দোবস্ত করে রাখবে আগে-ভাগে। তারপর কর্তা-গিন্নী যাবেন। তাঁদের যেন কোনও অসুবিধে না হয়।

শিশুর-মা এক-একদিন কথা তোলে। বলে—তুমি তো কাশী গিয়েছিলে, না দিদি ?

চারটে উনুনে হাঁ-হাঁ করে কয়লা পোড়ে। সব কথার জবাব দেবার সময় থাকে না মঙ্গলার। সব কথা কানে নিতে নেই। কানে নিতে গেলে ডালে নুন দিতে ভুলে যাবে, ভাতের ফ্যান গালতে হাত পুড়ে যাবে।

প্রথম খাজাঞ্চিখানার লোক খাবে। তিনজন খায় রোয়াকে বসে। শিশুর-মা তাদের পরিবেশন করবে বটে, কিন্তু যোগান দেবে তো মঙ্গলা। তারপর ধান-কলের লোক এসেছে দু'জন, তারা আজ এখানে খাবে। কল থেকে ম্যানেজারবাবু এসে বেলা বারোটায় ভাত চায়। মা-মণি, বো-মণির খাবার দিতে হবে পাঠিয়ে দুপুরবেলায়। দেরি হলে সিন্ধুর মুখ-ঝামটা দেখে কে! তারপর সবশেষে বেলা পুইয়ে গেলে খাবে কর্তাবাবু। তারপর যখন সকলের খেয়ে-দেয়ে কাজকর্ম সেরে চা-খাবার সময় হবে তখন ভাত নিয়ে বসবে মঙ্গলা।

—তুমি তো জীবনের কাজ শেষ করে দিয়েছ দিদি, কাশীবাস করেছ, বা বিশ্বনাথ দর্শন হয়ে গেছে, আমাদের পাপ আর কে খণ্ডাবে বলো !

রোজ বিশ্বনাথ দর্শন করতে তো ?

মঙ্গলা এ-কথার উত্তর দেয় না। বলে—হ্যাঁ রে, নফর খেতে এলো আজ ?

শিশুর-মা বলে—ওমা, নফর খাবে কি গো, নফর যে বড়বাবুর সঙ্গে বাগানবাড়িতে গেছে, সেখানে কালিয়া-কোপ্তা খাচ্ছে, ভূতারণবাবু গেছে, নফর তোমার এই কুমড়োর ঘন্ট খেতে আসছে !

মঙ্গলা লুকিয়ে রেখেছিল একথালা ভাত। দু'টুকরো পোনা মাছ। একটু কুমড়োর ঘন্ট। গরম ভাত খাওয়া কপালে নেই। তবু বাসি কড়কড়ে ভাতটা উনুনের পাশে রেখে দিলে তবু একটু গরম থাকে। নফরকে যেদিন ডেকে ডেকে এনে বসায়, রোয়াকের ওপর উঁচু হয়ে বসে ভাতগুলো গোগ্রাসে খায়।

বলে—শিশুর-মা, ডালটা কে রেঁধেছে গো ?

শিশুর-মা বলে—আর কে রাঁধবে, বামুনদিদি—

নফর বলে—কী ডালই রেঁধেছে মাইরি, একেবারে ডুব দিয়ে সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করছে—

শিশুর-মা বলে—যা দিয়েছি ওই দিয়ে খেতে হয় খাও, নয়তো উঠে যাও বাপু—

—কী বললে ? নফর রুখিয়ে ওঠে একবার।

শিশুর-মা আবার বলে—খেতে হয় খাও, নয়তো চলে যাও, রান্নাবাড়িতে এসে চোখ রাঙাবে নাকি ?

নফর আরো রেগে ওঠে। বলে—ডেকে নিয়ে এসো তোমার বামুনদিকে, মাইনে ফাইনে যখন বন্ধ করে দেব বড়বাবুকে ব'লে তখন পায়ে ধরতে আসবে এই শর্মার—

শিশুর-মা কোমরে আঁচলটা জড়িয়ে তেড়ে আসে। বলে—বামুনদি, খ্যাংরাটা নিয়ে এসো তো, ঝেঁটিয়ে ছোঁড়ার মুখ ভেঙে দিই—

—কী-ই-ই, এত বড় কথা!

এঁটো হাতেই নফর দাঁড়িয়ে ওঠে। বলে—ভাত দিচ্ছে বলে মাথা কিনে নিয়েছে নাকি? মাছ কোথায় শুনি? ইয়ারকি পেয়েচ তোমরা? এসো, এগিয়ে এসো, ঘুষি মেরে মাথা ফাটিয়ে দেব আজ, চেনো না আমাকে—

—তবে রে মিন্‌সের মরণ দশা হয়েছে—ব'লে শিশুর-মা খ্যাংরা-ঝাঁটাটা নিজেই নিয়ে এসেছে। নফরও তার চুলের মুঠি ধরে এক টান দিয়েছে।

শিশুর-মা তখন হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠেছে—ওগো, মিন্‌সে আমাকে মেরে ফেললে গো—

সে চীৎকারে রান্নাবাড়িতে লোক জড়ো হয়ে গেছে। খাজাঞ্চিখানা থেকে দৌড়ে এসেছে মুহুরিবাবু, বার-বাড়ি থেকে দৌড়ে এসেছে ফুলমণি, আস্তাবল-বাড়ি থেকে লাফাতে লাফাতে এসে হাজির গুলমোহর আলি। সিন্ধু দোতলার বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে বলে—কী হলো রে শিশুর-মা?

নফর তখনও চীৎকার করছে—আমি মাগীকে খুন করে ফেলব আজ, খুন করেঙ্গা—জরুর খুন করেঙ্গা—

মুহুরিবাবু ভয় পেয়ে গেল। হরি-জমাদার দাঁড়িয়ে ছিল সামনে। বললে—যা তো হরি, ভূষণ সিং-কে ডেকে নিয়ে আয় তো—

সবাই যখন উত্তেজনায় চীৎকারে অস্থির, তখনও রান্নাবাড়ির ভেতরে মঙ্গলা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। যেন কোনও দিকে খেয়াল নেই তার।

নফর চীৎকার করছে—আও হামারা সাথ লড়েগা, কোন্ লড়েগা হামারা সাথ, আও, আও,—তোমারা বামুনদিকে বোলাও—বোলাও বামুন-দিকো, মাছ চুরি করেগা, আবার ইয়ারকি—

ততক্ষণে ভূষণ সিং এসে গেছে এসেই নফরের ঘাড়ে এক লাথি

—এই উল্লু ! নিকালো—

আর সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক মন্ত্রের মতো যেন কাজ হয়ে গেল। এক আঘাতেই নফর যেন কেঁচোর মতো হয়ে গেছে। একেবারে কেঁচোটি ! আমতা-আমতা করছে তখন। বললে—এই ছাখো ভূষণ সিং, ভাত্‌মে মাছ দেতা নেই বামুনদি, বড়বাবুকো বোল্ দেও—উস্‌কো নকরী খতম্ কর দেও—

—আরে তুম্ তো ইধার আও পহেলে --

নফরের ঘাড় ধরে ভূষণ সিং বার-বাড়ির উঠোনে ছেড়ে দিলে। নফর অসহায়ের মতো চাইলে সকলের দিকে। বললে—আমারই দোষ দেখলে তুমি, আর আমাকে যে মাছ দেয় না খেতে—

ব'লে মুখের দিকে সহানুভূতির জন্যে আবার চেয়ে দেখলে।

কিন্তু সবাই হাসছে তখন কাণ্ড দেখে। মুহুরিবাবু বললে—মাছ কেন দেবে শুনি ? কোন্ কম্মে তুমি আছো হে ?

নফর বললে—কাজের কথা ছেড়ে দিন, তা বলে দুটো খেতে দেবে না, আমি কেউ নই ?

গুলমোহর আলিও হাসতে লাগলো। বললে—নফর পাগলা হো গিয়া—

মুহুরিবাবু বললে—তুমি কে হে শুনি ? কোন্ নবাবের দেওয়ান !

—ক্ষিদের সময় ঠাট্টা করবেন না, ঠাট্টা ভালো লাগছে না এখন—

—তা ভালো লাগবে কেন, বসে বসে খেতে ভালো লাগবে কেবল, কেমন ?

নফর বলে—আমি বসে বসে খাই !

—বসে বসে খাও না তো, কী করো শুনি ! সারাদিন তো পড়ে পড়ে ঘুমোও !

নফর বলে—তো কাজ দিন না আমাকে, কাজ না থাকলে কী করবো ? ঘুমোব না তো আপনাদের দাড়িতে হাত বুলোব ?

ব'লে যেন মস্ত রসিকতা করেছে এমনি ভাবে সকলের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো।

ভূষণ সিং তেড়ে আসে আবার। বলে—ফিন্ দিল্লাগি ?

—মেরো না ভূষণ সিং, শালা সারাদিন খাওয়া হোল না, পেট চোঁ-চোঁ করছে—ইয়ারকি আর ভাল্লাগে না—

কিন্তু তারপরে যখন চুপটি করে ঘরের ভেতর শুয়ে থাকে, তখন কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে টের পায় না। তেলাপোকা আর ছারপোকাতে ভর্তি ঘরখানা। ঘুম ভেঙেই দেখে পাশে যেন একটা ভাতের থালা। এক থালা ভাত যেন কে রেখে গেছে তার পাশে। বলেওনি কেউ, ডাকেওনি। টপাস্ করে উঠে পড়েছে নফর। মাছও দিয়েছে একটা।

বাইরের দিকে চেয়ে চেঁচালে—এই, কে রে ওখানে ?

কে যেন যাচ্ছিল উঠোন দিয়ে। তেমন খেয়াল করলে না। খেয়াল অবশ্য কেউ-ই করে না নফরকে।

—কে যায় রে, কে ওদিকে যায় ?

ভাতটা কে দিয়ে গেল তার খোঁজ নেওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু দূর হোক গে! টপ্ টপ্ করে ভাতগুলো খেয়ে নিয়ে আবার শুয়ে পড়তো নফর। তারপর ঘুম আসতো, কিন্তু পেটে ক্ষিদে থাকলে ভালো ঘুম আসে না যেন। শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যখন মনে হতো কোথাও গেলে হয়, তখনই আবার মনে হতো কোথায়ই বা যাবে। কোথাও গিয়েই বা কি হবে। ধোপার কাছে একটা গেঞ্জি দিয়েছিল, সেটা আনতে গেলে পয়সা দিতে হবে। তার চেয়ে শুয়ে থাকাই ভালো। শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেওয়াই ভালো।

আগে ক্ষিদে পেলে, রাগ হলে অমনি হৈ-চৈ করতো। এখন আর

সে-সব করে না। আদ্ধেক দিন খায় না। ঘুমিয়েই কেটে যায় বেশ। বার-বাড়ির উঠোনের এক কোণে নিমগাছটার পশ্চিম দিকে ছোট্ট একটা ঘর। গুরুদেব এলে ওইখানেই থাকেন। তা তাই-ই বা ক'দিন। বছরে একবার আসেন হয়ত। যে-ক'দিন থাকেন সে ক'দিন ঘর ধোয়া-মোছা হয়। ধূপ-ধুনো দেওয়া হয় ঘরে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সব। কিন্তু তিনি চলে গেলেই আবার তেলাপোকা আর উই-পোকার রাজত্ব। এ-ঘরের দিকে কেউ আর মাড়ায় না তখন। অন্ধকারে ধোঁয়ায় কালিঝুলের মধ্যে ওইখানেই পড়ে থাকে নফর। কেউ খোঁজ নেয় না, কেউ খবর নেয় না। শিশুর-মা মাঝে মাঝে আসে। বলে—এই নফর, খাবি নে? খেতে যাস্‌নি যে আজ?

—না, খাবো না, যা।

শিশুর-মা বলে—না খাবি তো বয়ে গেল ভারি, খাবি নে তো, পেটে খিল দিয়ে পড়ে থাক্, মরগে যা—আমার কী?

—আমি মরবো, তোর কী রে? আমি মরবো এখানে, তোর কী শুনি?

রান্নাবাড়িতে গিয়ে শিশুর-মা বলে—এলো না বাবু, এলোনা তোমার নফর!

বামুনদি বলে—হ্যাঁ রে, তা বলে ছেলেটা না খেয়ে থাকবে? আর একবার ডাক না গিয়ে!

—আমি বাপু ডাকতে পারবো নি, তোমার খুশী হয় নিজে ডাকো গিয়ে—

এক-একদিন খবরটা মা-মণির কাছেও যায়। বলে—হ্যাঁরে সিন্ধু, রান্নাবাড়িতে এত গোলমাল কিসের রে?

সিন্ধু বলে—ওই নফর, নফর আবার হৈ-চৈ বাধিয়েছে—

পুজোর সময় সকলের কাপড়-জামা হয়। কাপড়-জামা শুধু কর্তা-

গিন্নীদেরই নয়, সকলেরই হয়। বাড়ির কুকুর-বেড়ালটারও হয়। ওই জগত্তারণবাবু, দুর্লভবাবু, দুলালহরিবাবুরও হয়। শুধু তাই নয়, জগত্তারণ-বাবু, দুর্লভবাবু, দুলালহরিবাবুর ছেলে-মেয়েদেরও হয় সেই সঙ্গে সঙ্গে। জামা-জুতো-কাপড়, মোজা-গেঞ্জি সব। এ রেওয়াজ চলে আসছে সংসার সেনের আমল থেকে।

কিন্তু হঠাৎ নফরের যেন খেয়াল হয়েছে।

দ্যাখে ন'বৎ বসে গেছে দেউড়িতে। হরি-জমাদার লাল গেঞ্জি পরেছে। ভূষণ সিং কাপড় হলুদ দিয়ে ছুপিয়েছে। কী হলো? পুজো এসে গেছে নাকি?

খাজাঞ্চিখানায় গিয়ে বললে—খাজাঞ্চিবাবু, পুজো এসে গেল, আমার কাপড়-জামা কই?

কালিদাসবাবু খাতা থেকে মুখ তুলে বললেন—তোর কাপড়! কোথায় ছিলি তুই?

—ও-সব শুনছিনে, আমার কাপড় দিন, গেঞ্জি, পাঞ্জাবি, জুতো মোজা—সব দিতে হবে।

—ওরে বাব্বা, এ যে চোখ রাঙায় আবার, দেব না, না দিলে কী করবি তুই শুনি?

—দেবেন না মানে? আলবাৎ দিতে হবে, নইলে বড়বাবুকে বলে চাকরি খতম করে দেব সক্কলের।

ব'লে লম্ফ-ঝম্ফ করতে লাগলো নফর।

মুহুরিবাবু দেখে শুনে এগিয়ে এল। বললে—কী বলছিস নফর তুই? বলছিস কী?

—আজ্ঞে, যা বলছি ঠিক বলছি, সক্কলের পুজোর কাপড় হয়, আমার হয় না কেন শুনতে চাই।

কালিদাসবাবু বললেন—হবে না তোর কাপড়, কী করবি তুই করগে—

—কেন হবে না শুনি ? আমি কি এ বাড়ির কেউ নই ?

কোথায় যে এত জোর পায় নফর কে জানে। কিসের যে এত জোর তাও জানেনা কেউ। এ-বাড়ির কেউ নয় সে, কোনও সূত্রে এ-বাড়ির সঙ্গে সে কোনওভাবে যুক্ত নয়। চাকর-ঝিদের মতো তার মাইনেও নেই, আবার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেও কেউ নয় সে। এ-বাড়ির কেউ জানে না, কী সূত্রে সে আছে এখানে, কিসের টানে, কাদের জোরে। তবু তার সব জিনিসে ভাগ চাই আর-সকলের সঙ্গে। ভাত খাবার সময় আর-সকলের মতো মাছ চাই, পুজোর সময় কাপড়-জামাও চাই আর-সকলের মতো।

মুহুরিবাবু বললে—কোথায় ছিলি তুই ? তোর তো দেখাই পাওয়া যায় না।

—খাতায় যখন নাম আছে আমার তখন চুরি করেছ তোমরা, নির্ঘাৎ চুরি করেছ।

—তবে রে, চোর বলা ?

ব'লে মুহুরিবাবু ঘুষি পাকিয়ে এগিয়ে যেতেই নফরও মুহুরিবাবুর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে।

—শালারা চোর সব, আমার কাপড়-জামা চুরি করে আবার আমারই ওপর তম্বি, বড়বাবুকে বলে সকলের চাকরি খেয়ে দেব না ? আমাকে দেবে না শালারা···

ঠিক সময়ে কালিদাসবাবু দেখতে পেয়েছেন তাই, নইলে মুহুরিবাবুকে খেয়ে ফেলতো বোধ হয় নফর।

কালিদাসবাবু চীৎকার করে উঠলেন—ভূষণ সিং—ভূষণ সিং—

ভূষণ সিং দৌড়ে এসেই নফরকে ধরে ফেলেছে।

নফর বললে—ছাড়ো আমাকে দরোয়ান, ছাড়ো মাইরি, ছাড়ো বলছি, আমি যাচ্ছি বড়বাবুর কাছে ! দেখাচ্ছি মজা—

ভূষণ সিং ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে নফরকে, নফর কিন্তু তাতেও দমলো না। গায়ের ধুলো ঝেড়ে নিয়ে দৌড়লো। সেই ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে তর্ তর্ করে গিয়ে উঠলো একেবারে বড়বাবুর বার-বাড়ির ঘরে। বেশির ভাগ দিন ওখানেই থাকেন বড়বাবু। জগত্তারণবাবু বেশী রাতে গেলে বড়বাবু আর ভেতরে যেতে পারেন না। জগত্তারণবাবু যখন বড়বাবুর মাস্টারি করতেন, তখন থেকেই বড়বাবু ওই ঘরেই থাকেন।

নফর গিয়ে ডাকলো—বড়বাবু, বড়বাবু—আমি নফর—

এমন সময় অবশ্য ঘুম ভাঙে না। বড়বাবুর ঘুম ভাঙতে বড্ড দেরি হয়। খাস-বরদার পাঁচু বেলা দশটা থেকেই দাঁড়িয়ে থাকে বিছানার দিকে চেয়ে। ঘুম ভাঙলেই সিগারেটের টিনটা কিম্বা বোতলটা এগিয়ে দিতে হবে। কখনও-কখনও বড়বাবুর তেস্টা পায়। খাস-বরদার তা-ও সব রেডি করে রাখে। আগের দিন অনেকক্ষণ জগত্তারণবাবু গল্প করে গেছেন। বহুদিন আগে কর্তাবাবুর আমলে সেই যে জগত্তারণবাবু একদিন মাস্টার হয়ে এলেন, তারপর লেখাপড়া বেশিদূর হলো না। জগত্তারণবাবু অ্যাটর্নী হলেন, কর্তাবাবুও একদিন মারা গেলেন, বড়বাবুর বিয়ে হলো।

কর্তাবাবু গাড়িতে যেতে যেতে মাঝে-মধ্যে কখনও কখনও জিজ্ঞেস করতেন—খোকার কেমন লেখাপড়া হচ্ছে জগত্তারণবাবু?

জগত্তারণবাবু বলতেন—আজ্ঞে, বড়বাবুর ব্রেন্‌টা ভালো, আমার চেয়েও ভালো ব্রেন, কিন্তু একটা দোষ, খাটতে চাইবে না মোটে—

কর্তাবাবু বলতেন—ও আমার স্বভাব পেয়েছে—

কাশীধামে যাবার আগে জগত্তারণবাবুর কোনও কাজ ছিল না। কর্তাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতেন। কিন্তু ভিক্ষে করে সংসার চলে না। তারপর কাশী থেকে এসে যেবার দত্তক নিলেন, তার কয়েকবছর পরেই ছেলের লেখাপড়ার ভারটা দিলেন জগত্তারণবাবুর ওপর। পোষ্যপুত্র, বেশী

বকা-ঝকা চলে না। সেই থেকেই জগত্তারণবাবু এসে পড়াবার সময় গল্প দিতেন।

—জানো বড়বাবু, আজকে এক মক্কেল কাৎ হলো।

ছোটবেলা থেকে বড়বাবুকে মক্কেল কাৎ হবার গল্প শুনিয়ে এসেছেন জগত্তারণবাবু। বড়বাবুর ধারণা হয়েছে মক্কেলরা কাৎ হবার জন্যেই জন্মায়। নুলো মল্লিকের ছেলে কার্তিক মল্লিকের থেকে শুরু করে কোনও মক্কেল আর কাৎ হতে বাকি রইল না কলকাতায়।

বড়বাবু বলেন—আমাদের ব্যাকা শালের খবর কি গো মাস্টার?

জগত্তারণবাবু বলেন—সে-ও এইবার কাৎ হবে বড়বাবু, আর দুটো দিন সবুর করো না, তারও পাখা উঠেছে, খবর পেইছি আমি—

—আর সেই ন্যাড়া মিত্তির, সেই যে খুব কাপ্তেনি করলে ক'দিন!

জগত্তারণবাবু বলেন—আরে, সে কবে কাৎ হয়েছে, উড়তে-না-উড়তে কাৎ হয়েছে, তোমাকে তো বলেছি সে-খবর! মনে নেই তোমার?

তারপর যাবার আগে চুপি চুপি বলেন—টেঁপির শরীরটা বড় খারাপ, খবর পাওনি তুমি?

বড়বাবু বলে—শরীর খারাপ? টেঁপির? কই, শুনিনি তো?

—বোধহয় লজ্জায় বলেনি!

—কেন, লজ্জা কিসের?

জগত্তারণবাবু বলেন—লজ্জা হবে না? কী বলো তুমি বড়বাবু, মেয়েমানুষের লজ্জা হয় বৈকি! তোমারই খাচ্ছে, তোমারই পরছে, তোমার খেয়ে-পরেই মানুষ, কথায় কথায় জ্বালাতন করতে লজ্জা হবে না! হাজার হোক মেয়েমানুষ তো?

বড়বাবু বললেন—তাহলে কী করতে হবে মাস্টার?

জগত্তারণবাবু বললেন—একবার যেতে হবে তোমায় বড়বাবু, শরীর খারাপ হোক আর যা-ই হোক, যাওয়া তোমার একবার উচিত—

বড়বাবু বললেন—স্টেটের অবস্থা তো তেমন ভালো নয় এখন—

—একবার শুধু যাবে আর আসবে ; স্টেটের ভালো-মন্দের সঙ্গে তার কী ? তুমি তো থাকছো না সেখানে—! আর অনেকদিন তো ও-সব হয়-টয়নি, শেষে কি শুক্রাচার্য হয়ে যাবে নাকি ?

বড়বাবু বললেন—তা হলে নফরকে ডাকতে হবে—

—হ্যাঁ, নফরকে দিয়ে আমার আপিসে খবর দিয়ো, আমি তৈরি হয়ে থাকবো'খন।

এরকম মাঝে মাঝে ঠিক নিয়ম করে টেঁপির শরীর খারাপ হয়। স্টেটের অবস্থা খারাপ বলে বড়বাবু একবার আপত্তিও করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরের দিন জগত্তারণবাবুর কথায় ভোরবেলাই নফরের ডাক পড়ে। কিন্তু খাবার সময় জগত্তারণবাবু ভেতর-বাড়িতে গিয়ে মা-জননীর পায়ের ধুলোও নেন।

বলেন—কই, মা-জননী কোথায়, পায়ের ধুলো একটু নিতাম যে—

সেই ওপরে আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকবেন মা-মণি। বাইরে ঘোমটা দিয়ে সিন্ধুই বকলমায় কথা বলবে। খোকার কথা হবে।

সিন্ধু বলবে—আমার এক ছেলে, আপনিই এককালে ওর মাস্টার ছিলেন, আপনিই ভরসা আমার—

জগত্তারণবাবু বলবেন—গীতাখানা তো আজও পড়ালাম, চতুর্দশ অধ্যায়টা শেষ করে দিলাম, ও-সব বদ চিন্তা-টিন্তা যাতে না-আসে আর কি ' তবে একটু সময় লাগবে, অনেক দিনের অব্যেস তো।— আপনি কেমন আছেন মা-জননী ?

সিন্ধু বলবে—আমার আর থাকা—

জগত্তারণবাবু বললেন—আপনারা পুণ্যাত্মা লোক, আপনারা সুস্থ থাকলে পৃথিবীটা তবু একটু সুস্থ থাকে, নইলে পাপ যে-রকম বাড়ছে—

তারপর সেই রুপোর বাটি থেকে পায়ের ধুলো নিয়ে জিভে চেটে

মাথায় ঠেকাবেন। এমনি প্রায়ই। এমনি বহুদিন থেকেই চলছে। খাস-বরদার পাঁচু এসব জানে। ঘুম ভাঙবার সময় তাই পাঁচু সিগারেটের টিন, দেশলাই, যাবতীয় জিনিস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কখন বড়বাবু উঠবে তার আশায়।

হঠাৎ বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ পেয়েই পাঁচু গিয়ে ঘোরানো সিঁড়ির দরজা খোলে—কে রে?

—বড়বাবু কোথায়? আমি নফর।

পাঁচু বলে—নফর তা এখন কী? বড়বাবু তো তোকে ডাকেনি!

নফর বললে—বড়বাবু ডাকেনি তো কী হয়েছে, আমার কাজ আছে বড়বাবুর কাছে।

—কী কাজ?

নফর বললে—ছাখ তো পাঁচু, এই ছাখ্, আমাকে মেরে একেবারে তক্তা বানিয়ে দিয়েছে, রক্ত বেরোচ্ছে দেখছিস্? পুজোর কাপড় সকবাই পেলে, বাড়ির ঝি-চাকর দাসী-বাঁদী কেউ বাদ গেল না, ওই বেটা হারামজাদা মুহুরিবাবু আমার কাপড়টা মেরে···

—কে রে? কে ওখানে?

গম্ভীর গলার আওয়াজ শোনা গেল ভেতর থেকে। পাঁচু লাফিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকলো।

—কে চেঁচাচ্ছে রে ষাঁড়ের মতো? সকালবেলা দিলে ঘুমটা ভাঙিয়ে।

—আজ্ঞে, ও নফর।

—জুতো মেরে বের করে দে ওকে, বেটা ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে—

কালিদাসবাবু বলেন—কোথায় গেল রে নফরটা?

মুহুরিবাবু বলে—বড়বাবুর কাছে গেছলো, দিয়েছে বেটাকে টিট্ করে তাড়িয়ে, এখন জব্দ—

সত্যিই জব্দ হয়ে যায় নফর। আবার এসে আস্তে আস্তে ঢোকে নিজের ঘরটাতে! পাশেই গুরুদেবের খালি তক্তাপোশটা। তার তলায় নফরের বিছানাটা গোটানো থাকে। আবার সেইটে খুলে শুয়ে পড়ে। দূর হোক্ গে। না দিক কাপড়, না দিক জামা, না দিক মাছ—ঘুমিয়ে পড়লে আর কিছু মনে থাকবার কথা নয়। এ-বাড়ির যেখানে যা-কিছু হোক, তাতে কিছু এসে যায় না নফরের, নফর ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই এই এতগুলো বছর যদি কাটিয়ে দিয়ে থাকে তো আরও ক'টা বছর কাটিয়ে দিতে পারবে—

আজ কিন্তু খাস-বরদার পাঁচুই দৌড়ে এসেছে। রোজকার মতো ঘুমিয়েই ছিল নফর।

—নফরবাবু, নফরবাবু!

নফর তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছে। বললে—কি রে পাচু? বড়বাবু ডেকেছে নাকি?

—ডেকেছে।

—কী বললে?

—বড়বাবু ঘুম থেকে উঠতেই সিগারেটের টিনটা এগিয়ে নিয়ে সামনে ধরেছি, বড়বাবু আড়মোড়া ভাঙতে-ভাঙতে বললেন—হ্যাঁ রে, নফর কোথায়, নফরকে যে আর দেখতে পাইনে, নফর কি মরে গেছে নাকি!

এর বেশি আর বলতে হয় না। এর বেশি আর বলার দরকার হয় না।

কথাটা শুনে নফরের এক গাল হাসি বেরোল।

বললে—জয় মা কালী—ব'লে বিছানাটা গুটিয়ে রেখে নফর এক দৌড়ে খাজাঞ্চিখানায় গেল। কালিদাসবাবু তখন খাতা দেখছেন। মুহুরিবাবু হিসেবের খাতার মধ্যে ডুবে আছেন।

নফর সোজা গিয়ে বললে—এই যে খাজাঞ্চিবাবু, পাঁচটা টাকা ছাড়ুন তো, পাঁচটা টাকা—

কালিদাসবাবু ক্ষেপে গেলেন—আবার এসেছিস ? সেদিন বড়বাবুর কাছে জুতো খেয়েও তোর জ্ঞান হলো না রে ?

মুহুরিবাবু বললে—বেরো এখান থেকে,—বেরো বলছি হারামজাদা !

নফর বললে—বাজে কথা বোলো না বেশি, পাঁচটা টাকা ছাড়ুন, বড়বাবু ডেকেছে—সময় নেই আমার—

বড়বাবুর নাম শোনার পরই কালিদাসবাবুর মুখের চেহারাটা যেন বদলে গেল।

বললেন—বড়বাবু ডেকেছেন ?

তারপর একটু ভেবে বললেন—মাসের শেষে এই অসময়ে তোমায় ডাকলে ?

নফর বলে—দিন দিন, টাকা দিন মশাই, সময় নেই আমার, বড়বাবু আবার ক্ষেপে যাবে—

শুধু কালিদাসবাবুই নয়। সমস্ত বাড়িখানার চেহারাই যেন তারপর একেবারে বদলে যাবে। সারা বাড়িতে খবর রটে যাবে যে বড়বাবু নফরকে স্মরণ করেছেন। তারপর সেই টাকা নিয়ে নফর ধোপার বাড়ি যাবে। সেখান থেকে কাচা জামা-কাপড় এনে চুল ছাঁটবে। দাড়ি কামাবে। তখন আর চেনা যাবে না নফরকে। তখন আর নফর নয়, নফরবাবু। ভেতর-বাড়িতে মা-মণি পেস্তা-বাদাম বাটতে বলবে। পেস্তা-বাদাম বাটা হবে সকাল থেকে। মাছের মুড়ো আসবে। বাজার থেকে সেদিন নতুন করে বাজার আসবে। বৌ-মণি সেদিন নতুন করে স্নান করবে আবার। সাজবে গুজবে। বড়বাবুর দাড়ি কামাতে এসে অধর নাপিত সেদিন মোটা বকশিশ পাবে।

সিন্ধু যদি জিজ্ঞেস করে—আজকে আবার পেস্তা-বাদাম বাটছে কেন মা-মণি ?

মা-মণি বলবেন—আজ যে খোকা নফরকে ডেকেছে—

রান্নাবাড়িতে সেদিন হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে যাবে। হুলুস্থুল এমনিতেই সেখানে বেধে থাকে সব সময়। ভাত চড়াতে চড়াতে ডাল পুড়ে যায়, ডাল সাঁতলাতে গিয়ে ভাত গলে যায়। কিন্তু সেদিন আর ফুরসুৎ থাকবে না বামুনদির।

বলে—বাটনা কী হলো শিশুর-মা?

শিশুর-মা'র সেদিন সদর-অন্দর করতে-করতে পা ছুটো টনটন করে ওঠে। তারপর বড়বাবুর ফরমাশ আর হুকুমের ঠ্যালায় সারা বাড়ি চরকির মতো ঘুরতে থাকে। নফরের কী দাপট তখন! ভূষণ সিং যে ভূষণ সিং সে-ও যেন কেমন সমীহ করে কথা বলবে নফরের সঙ্গে। নফরকে আর চেনাও যায় না তখন। চুল ছেঁটে ফরসা জামা-কাপড় পরে নফর রান্নাবাড়িতে গিয়ে ভাত চাইবে। সেদিন আর মাছ নিয়ে ঝগড়া বাধবে না শিশুর-মা'র সঙ্গে।

শিশুর-মা'র যে অত তেজ, সেই শিশুর-মা-ই বার বার জিজ্ঞেস করবে—আর ছুটো ভাত দেব নাকি নফরবাবু!

—না না।

বলতে গেলে নফর সেদিন কিছুই খাবে না। ভাত খেয়ে পেট ভরিয়ে রাত্তিরের ক্ষিদেটা নস্ট করবে না নফর।

নফর বলবে—এত মাছ দিলে কেন আজ আবার? আজ তো ও-বেলা মাংস খাবো।

এ-বাড়ির ইতিহাসে এরকম ঘটনা নতুনও নয়, আবার নিত্য-নৈমিত্তিকও নয়। মাসের আর ক'টা দিন নফরের খোঁজ রাখবার প্রয়োজন মনে করে না কেউ, কিন্তু সেদিন নফরই সব। নফরই বড়বাবুর ডান হাত সেদিন। কথায় কথায় নানা কারণে বড়বাবু নফরকে ডাকবেন। খাস-বরদার পাঁচুকে সামনে পেয়েই ধমকাবেন।

বলবেন—নফর কোথায়? নফরকে ডাকতে বলেছিলুম না তোকে?

—হুজুর, ডেকেছিলুম তো, আপনি তো মাস্টারবাবুর কাছে পাঠালেন।

—পাঠালুম তো সারাদিনের মতো পাঠালুম? এলো কিনা দেখবি তো?

আবার দৌড়তে হয় বার-বাড়িতে। নফর এল কিনা খোঁজ নিতে হয়। নফরের ঘরখানায় কেউ তখন নেই। বিছানাটা গুরুদেবের তক্তপোশের তলায় গুটোনো পড়ে আছে। কেউ নেই সেখানে। গুলমোহর আলি সেদিন আবার পোশাক পরে তৈরি হয়ে নেবে। আবদুল আবার অনেকদিন পরে গাড়ি জোড়ে। ঘোড়াটা আবার গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে পা ঠোকে। গুলমোহর আলি তখনও গাড়ির মাথায় ছিপটি নিয়ে বসে আছে। বড়বাবু এসে উঠলেই হাঁকিয়ে দেবে।

কিন্তু তখনও নফরের দেখা নেই।

খাস-বরদার পাঁচু একবার খাজাঞ্চিখানায় গিয়ে উঁকি মারে।

—কী রে? কাকে খুঁজছিস?

—নফরকে দেখেছেন হুজুর?

মুহুরিবাবু বলে—নফর তো পাঁচটা টাকা নিয়ে দৌড়ল ধোপার বাড়ি। তারপর তো দেখলাম বাবু সেজে ফিটফাট হয়ে বেরিয়ে গেল—

তারপর দরোয়ানদের ঘরে।

—ভূষণ সিং, নফর-বাবুকো দেখা?

রান্নাবাড়িতে গিয়েও খোঁজ নেয় পাঁচু।

—হ্যাঁ গো শশীর মা, নফর খেয়েছে আজ? বামুনদিকে জিজ্ঞেস করো তো?

নফর আজকে কাজে ফাঁকি দেবে না। আজকেই তার আসল কাজ। অ্যাটর্নীবাবুকে কম্বুলিটোলা থেকে একেবারে নিয়ে এসেছে। জগত্তারণবাবু এসে গেলেন ঠিক সময়েই।

মা-মণির ঘরের সামনে গিয়ে বড়বাবু ডাকলেন—মা !

বড়বাবুর আঙুলে অনেকগুলো আঙটি ঝকঝক করে উঠলো। কোঁচানো ধুতির কোঁচাটা লুটোচ্ছিল ! খাস-বরদার এসে তুলে ধরলে উচু করে। বড়বাবু হাতের ছড়িটায় ভর দিয়ে দাঁড়ালেন মা-মণির ঘরের সামনে।

সিন্ধুকে ডেকে খাস-বরদার বললে—ওরে মা-মণিকে ডেকে দে তো একবার

মা-মণি বেরিয়ে আসতেই বড়বাবু পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন।

—মা, আসি তা হলে ?

মা-মণি বললেন—আবার যাচ্ছো খোকা ? এই সেদিন অসুখ থেকে উঠলে, এখনও শরীরটা সারেনি যে তোমার—

বড়বাবু বললেন—এই যাবো আর আসবো মা—

মা-মণি সিন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁরে, পেস্তার শরবতটা দিয়েছিলি খোকাকে ?

বড়বাবু বললেন—খেয়েছি মা, সব খেয়েছি—

—শরবতে মিষ্টি হয়েছিল ?

এর পর বৌ-মণি। ঘোমটা দিয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল দরজার আড়ালে। বড়বাবু ঘরে আসতেই বৌ-মণি বললে—এই শরীর খারাপ নিয়ে নাই-বা গেলে।

বড়বাবু বললেন—এই যাবো আর আসবো—

—এবার যেন আর তিন-চারদিন থেকো না, তোমার শরীরের অবস্থা তো ভালো নয় !

এর পর মা-মণি জগত্তারণবাবুকে ডেকে পাঠাবেন।

জগত্তারণবাবু সিঁড়ির নিচেয় এসে দাঁড়ালেই ওপর থেকে মা-মণির

বকলমায় সিন্ধু বলবে—দেখুন, আপনি রইলেন সঙ্গে, দেখবেন খোকা যেন অত্যাচার না করে বেশি—

জগত্তারণবাবু যথারীতি বলবেন—সে কি কথা, আমি থাকতে বড়বাবুর কিছু অত্যাচার হবে না, নেহাত বড়বাবু আবদার ধরেছে তাই—নইলে···

তারপর খাজাঞ্চিবাবুর কাছ থেকে টাকাকড়ি নিয়ে বড়বাবু গাড়িতে উঠবেন। তার পর উঠবেন জগত্তারণবাবু, তারপর উঠবে নফর। গাড়ি ছেড়ে দেবে গুলমোহর আলি। আর ভূষণ সিং ঘড়ঘড় শব্দ করে গেট খুলে দেবে।

এমনি করেই প্রত্যেক মাসে একবার করে বড়বাবুর শরীর খারাপ হয়। প্রত্যেক মাসে একবার করে ভোরবেলা নফরের ডাক পড়ে। এমনি করেই প্রত্যেক মাসে একবার খাজাঞ্চিখানা থেকে কয়েক হাজার টাকা বেরিয়ে যায় নিঃশব্দে। তারপর তিন রাত্রি কাটবার পর আবার যখন ফিরে আসেন বড়বাবু—তখন পকেটের টাকা সব খরচ হয়ে গেছে। দেনাও হয়ে গেছে প্রচুর।

বড়বাবু বাড়ি এসেই সাস্টাঙ্গে মা-মণির সামনে পড়ে যান।

বলেন—মা, তোমার অধম সন্তানকে ক্ষমা করো মা—

মা-মণি বলেন—ওঠো ওঠো বাবা, এ ক'দিনে কী চেহারা হয়েছে—

—না, উঠবো না, তুমি আগে বলো অধম সন্তানকে ক্ষমা করেছ—

মা-মণি এক ধমক দেন খাস-বরদার পাঁচুকে। বলেন—হাঁ করে দেখছিস কী, ধরে তোল্, ধরে তুলে নিয়ে যা ঘরে—

প্রত্যেকবারই জাগত্তারণবাবু আসেন। বলেন—মা, আসতে কি চায় বড়বাবু, কী যে আটা, অনেক বলে-কয়ে তবে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি—

আবার নফরের সেই দশা। আবার নফর গিয়ে ঢোকে তার কোটরে। সেই তক্তপোশটার তলা থেকে আবার গুটোনো বিছানাটা টেনে নিয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে। আবার কোথায় তলিয়ে যায় নফর। কেউ খবর রাখে না তার।

কিন্তু এবার এক কাণ্ড ঘটলো।

বিকেল নাগাদ বড়বাবুর গাড়ি বেরিয়ে গেল। তারপরই সব ভোঁ-ভোঁ! কারো আর কোনও কাজে মন দেবার কথা নয়। সব এলিয়ে পড়ে। অন্দরে বাইরে যেন একটা আল্‌সে-আল্‌সে ভাব। হরি-জমাদার থেকে শুরু করে ফুলমণি, সিন্ধু, খাজাঞ্চিবাবু, মুহুরিবাবু, শিশুর-মা সবাই যেন একটু ঢিলে দেয়। আর কী, বড়বাবু তো বাড়ি নেই! নফরকে নিয়ে যখন বেরিয়েছেন বড়বাবু তখন তিন-চারদিনের ধাক্কা তো বটেই।

কিন্তু এবার এক কাণ্ড ঘটে গেল।

কাণ্ডটা ঘটলো বড় হঠাৎ।

রাত্রিবেলা বলা-কওয়া-নেই হঠাৎ গুরুপুত্র এসে হাজির। কাশীর গিরিগঙ্গাধর বাচস্পতির ছেলে মা-মণির গুরুপুত্তুর। ভূষণ গেটের পাশেই শুয়ে ছিল।

বললে—কৌন হ্যায়?

—আমি, আমি রে, দরজা খোল্!

গলা শুনেই ভূষণ সিং ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করে।

—হুজুর, বড়বাবু নেই, বড়বাবু বাহার গিয়া।

দরজা খুলে গেল। ভূষণ সিং খবর দিলে ভেতরে। পয়মন্ত খেয়ে-দেয়ে শোবার বন্দোবস্ত করছিল। সে গিয়ে খবর দিলে সিন্ধুমণিকে। সিন্ধুই ডেকে দিলে মা-মণিকে। মা-মণি তখনও শোননি। বললেন—রান্নাবাড়িতে খবর দে, ঠাকুরমশাই এসেছেন—

ঠাকুরমশাই এমনিতে খবর না দিয়ে আসেন না। মা-মণি উঠে থানটা বদলে নিলেন। সিন্দুক থেকে পঞ্চাশটা টাকা বার করলেন। প্রণাম করে দক্ষিণা দিতে হবে সিঁড়িতে আলো নিভে গিয়েছিল। আবার চারদিকে আলো জ্বলে উঠলো। মা-মণি সিন্ধুকে বললেন—ঠাকুরমশাইকে সঙ্গে করে নিয়ে আয় ওপরে।

জলচৌকি পাতা ছিল। তার ওপর রেশমের আসন। আসনের ওপর পদ্মাসন করে বসলেন গুরুপুত্র। মা-মণি প্রণাম করলেন গলবস্ত্র হয়ে। তারপর পায়ের কাছে দক্ষিণাটা রাখলেন। গুরুপুত্র বললেন—বড় বিব্রত হয়ে পড়েছি আমি—তাই অত দূর থেকে ছুটে এলাম আপনার কাছে—

—কী নিবেদন বলুন !

ঠাকুরমশাই বললেন—আমার বাবা দেহত্যাগ করেছেন সম্প্রতি—

মা-মণি স্তম্ভিত হলেন। বললেন—কবে ? আমি তো খবর পাইনি ?

—বড় শীঘ্র ঘটে গেল, তাই আর সংবাদ দিতে পারিনি আপনাকে। কিন্তু আমি নিজেই যখন আসবো তখন পত্রে সংবাদ দেবার দরকার মনে করিনি—

মা-মণি বললেন—এই বিপদের সময় আপনি নিজে কষ্ট করে কেন এলেন ?

—সেই বলতেই এসেছি। আপনার মনে আছে, কর্তাবাবু কাশী গিয়েছিলেন আপনাকে নিয়ে, আপনার দারুণ অসুখ হয়েছিল সেখানে —প্রায় একবছর শয্যাশায়ী হয়ে ছিলেন আপনি ?

সে অনেকদিন আগের কথা। ওই মঙ্গলাও গিয়েছিল সঙ্গে। তখন সিন্ধুমণি ছিল না। কুঞ্জবালা গিয়েছিল সঙ্গে। দশাশ্বমেধ ঘাটের ওপর বাড়ি কেনা হয়েছিল। সাজানো হয়েছিল বাড়ি। সারাদিন গঙ্গার হাওয়া সেবন। আর সকাল-সন্ধ্যায় বিশ্বনাথ-দর্শন। কিন্তু হঠাৎ মা-মণি অসুখে

পড়লেন। অসুখ মানে সে এক ভীষণ অসুখ। কর্তাবাবু মুশকিলে পড়লেন। বিদেশে কোথায় ডাক্তার, কোথায় কবিরাজ কিছুই জানা নেই। গুরুদেব কাশীবাসী। তিনিই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কলকাতায় টেলিগ্রাম চলে গেল। খাজাঞ্চিবাবু টাকা নিয়ে নিজে চলে গেলেন।

সে একদিন গেছে বটে!

গুরুপুত্র বললেন—বাবার কাছে শুনেছি, আপনার তখন জ্ঞান ছিল না—

—আমি যে বেঁচে উঠেছিলাম, সে তো কেবল গুরুদেবেরই আশীর্বাদে—

গুরুপুত্র বললেন—মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে আমার বাবা সমস্ত ঘটনা আমায় বলে গেছেন, আপনি যে জীবন ফিরে পেয়েছেন সে বাবার আশীর্বাদে নয় মা, রাহু আপনার মারক গ্রহ, নেহাত বৃহস্পতির প্রভাবে সেদিন আপনার প্রাণহানি হয়নি, কিন্তু কেতু-মঙ্গলের প্রভাবে আপনার চরম ক্ষতি চরম সর্বনাশ ঘটে গেছে—। সেই কারণেই বাবা সেই সময়ে আপনাদের বিশ্বনাথের চরণে নিয়ে যেতে অত পীড়াপীড়ি করেছিলেন—

—সে তো আমি জানি।

—না, সব আপনি জানেন না, কর্তাবাবু সব আপনাকে জানান্‌নি, জানিয়েছিলেন বাবাকে, সেই কথা বলতেই আমি এসেছি আজ। কর্তাবাবু বলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর বিশ বছর পরে আপনাকে জানাতে, আজ বিশ বছর পূর্ণ হয়েছে—

ঠাকুরমশাই সিন্ধুমণির দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—আগে আপনার দাসীকে চলে যেতে বলুন এখান থেকে—

রাত তখন এগারোটাও হতে পারে, বারোটাও হতে পারে। অন্যদিন এ-সময়ে সব চুপচাপ হয়ে যায়।

সিন্ধুমণি কথাটা শুনেই আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। মা-মণি না ঘুমোলে সিন্ধুও ঘুমোতে যেতে পারে না। সিঁড়ির পাশে খাঁচার টিয়াপাখীটা একবার পাখা-ঝাপ্‌টে উঠলো। বেচারীর চোখে আলো লেগে ঘুম আসছে না। ভেতরে অনেকক্ষণ ধরে কী যেন কথা হতে লাগলো। সমস্ত বাড়ি নিঝুম। বড়বাবুও নেই। থাকলে একটু রাত হয়। তা সে খাস-বরদারের কাজ। ভেতর-বাড়িতে তা নিয়ে কেউ জেগে থাকে না।

শিশুর-মা দাওয়ার ওপরেই ঘুমোচ্ছিল। অঘোরে। রাত বোধহয় তখন অনেক হয়েছে। রান্নাবাড়ির চারটে উনুনই নিভে গিয়েছিল। একটায় তখন আগুন দেওয়া হয়েছে আবার নতুন করে।

—ও শিশুর-মা, শিশুর-মা!

সারাদিন খেটেখুটে মরণ-ঘুম ঘুমিয়েছে শিশুর-মা। কোনও সাড়া-শব্দ নেই। মেঝেতে আঁচলটা পেতে সেই যে পড়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে মড়ার মতো কাৎ হয়ে গেছে। উনুন-টুনুন সবই তো নিভে গিয়েছিল। গুরুপুত্রের আসার খবর পেয়ে আবার উনুনে কয়লা দিতে হয়েছে। শিশুর-মা আঁচ দিয়ে ডাকতে গিয়েছিল দু-দু'বার। ঠাকুরমশাই-এর জন্যে চাল হাঁড়িতে চড়িয়ে দিতে হবে, তারপর তিনি নিজে নাবিয়ে নেবেন। শিশুর-মা ফিরে এসে বললে—একটু দেরি হবে বামুনদি—

—ওরে, আর একবার যা না শিশুর-মা!

আবার গেছে। আবার সেই একই উত্তর। সিঁড়ির বাইরে বসে বসে সিন্ধু ঢুলছে। ভেতরে মা-মণির সঙ্গে কথা বলছেন তাঁর গুরুপুত্র।

একটা বেড়াল বুঝি এঁটো-কাঁটার লোভে টিপি-টিপি পায়ে রান্নাবাড়ির ভেতরে ঢুকছিল, মঙ্গলা তাড়িয়ে দিলে।

—বেরো, বেরো, দূর হ—

সিন্ধুমণি হঠাৎ দৌড়তে দৌড়তে এল।

—বামুনদি, মা-মণি ডাকছেন তোমায়।

আমাকে! মঙ্গলা যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়াল!

—আমাকে? কেন রে?

মঙ্গলাও অবাক হয়ে গেল। তার তো জীবনে কখনও ভেতর-বাড়িতে ডাক পড়েনি!

সেই-যে কতদিন আগে একদিন এ-বাড়িতে কাশীধামে যাবার সময় মা-মণির সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিল অন্দরমহলে, সেই-ই প্রথম আর সেই-ই শেষ। তারপরে কাশী থেকে এসে আর কখনও কারো মুখের দিকে চেয়ে দেখবার দরকার হয়নি। এই রান্নাঘরের মধ্যেই তার সূর্যোদয় হয়েছে, সূর্যাস্তও হয়েছে। বর্ষা গ্রীষ্ম শীত বসন্ত, ষড়ঋতুর সমস্ত পরিচয় নিঃশেষ হয়ে ফুরিয়ে গিয়েছে কবে তার ঠিক নেই। কারোরই ঠিক নেই, সবাই এসে ঠিক সময়ে ভাত পায়, ডাল পায়, ঝোল পায়—তারপর যথাসময়ে চলেও যায়। এর বেশি কোনদিন তার কথা কেউ জিজ্ঞেস করেনি। উত্তরও কেউ পায়নি।

আজকে এতদিন পরে তার উত্তর দেবার ডাক পড়ল বুঝি!

রান্নাবাড়ির বাইরে যেতে গিয়ে মঙ্গলার পা যেন বার বার বেধে যেতে লাগলো। অভ্যেস নেই এদিকে আসা। রাত্রে পথটা যেন আরো উঁচু-নিচু।

—আমাকে কেন ডাকছে রে সিন্ধু, জানিস্ কিছু তুই?

ভাগ্যের পথ বোধহয় এমনি কুটিল! মঙ্গলার ভাগ্য কবে কোন্ বিধাতাপুরুষ গড়েছিল কে জানে। কাশীধামে যাবার সময়ও ঠিক বুকটা দুরদুর করে কেঁপে উঠেছিল। সেদিনও রাত্রের একটা রেলে চড়ে যেতে হয়েছিল তাদের। আগের গাড়িতে মোট-লটবহরের সঙ্গে গিয়েছিল সরকার-মশাই আর মেয়েদের গাড়িতে কুঞ্জবালা আর মঙ্গলা। কুঞ্জবালা পান কিনে খেয়েছিল ইস্টিশান থেকে। মঙ্গলাকেও একটা দিতে চেয়েছিল।

—পান খাস না তুই মঙ্গলা ?

মঙ্গলা বলেছিল—সোয়ামী যাবার পর আর পান খাইনে দিদি।

তার ওপর ইস্টিশানের পান ! কত লোকের ছোঁয়ান্যাপা। কে কোন্ জাতের লোক কে জানে ! সেই ট্রেন কাশী পৌঁছোতেই পাণ্ডার লোক এসে তুলে নিয়ে গিয়েছিল কর্তাবাবুর নতুন-কেনা বাড়িতে। কেমন ভয়-ভয় করতো মঙ্গলার ! এ কোন্ দেশ, কত বড় গঙ্গা। কোথায় ছিল এক অজ পাড়াগাঁয়ের মানুষ, কেমন রেলগাড়ি চড়ে কত দূরে বাবা বিশ্বনাথের চরণে এসে এক দণ্ডে পৌঁছে গেল।

কুঞ্জবালা সেয়ানা ছিল খুব।

বলতো—লম্বা করে ঘোমটা দে মঙ্গলা, বেটা-ছেলে আসছে—

লম্বা ঘোমটাই ছিল মঙ্গলার। সেটা আরো লম্বা করে দিত। কর্তাবাবু আর মা-মণি যাবার পর সেই যে রান্নাঘরে ঢুকলো সে, আর বার হতে পারেনি সেখান থেকে। দিন-রাত রান্না করা আর দরকার না-থাকলে রান্নাঘরের সামনে বসে থাকা। কুঞ্জবালাই ছিল সব। কুঞ্জবালাই রান্নাঘরে এসে খাবার নিয়ে যেত, পরিবেশন করতো। কর্তাবাবুর যে কেমন চেহারা তা পর্যন্ত কোনওদিন দেখেনি মঙ্গলা, কানেই শুনতো কিছু কিছু। কর্তাবাবু যেতেন বেড়াতে, সঙ্গে যেতেন মা-মণি। কুঞ্জবালাও এক-একদিন সঙ্গে যেত !

কিন্তু একদিন হঠাৎ অসুখে পড়লো মা-মণি।

তারপর ডাক্তার-কবিরাজ ওষুধ-বিষুধ—কিছু আর বাকি রইল না। কলকাতার বাড়ি থেকে লোকজন গেল সব। দূর থেকে শুধু ওষুধের গন্ধ আর লোকজনের আসা-যাওয়ার শব্দ কানে আসতো। শেষকালে অসুখ বুঝি বিকারে দাঁড়ালো। তখন আজ-যায় কাল-যায় অবস্থা।

সেই সময়েই কাণ্ডটা ঘটলো।

ঠাকুরমশাই বললেন—কাণ্ডটা সেই সময়েই ঘটলো—

মা-মণি তখন দিনের পর দিন অজ্ঞান অচৈতন্য। ডাক্তার কবিরাজ আসছে—

কুঞ্জবালা একদিন এসে বললে—মা-মণি আর বাঁচবে না রে, কবিরাজ মশাই বলে গেছে—

মা-মণি মারা গেলে কী হবে! চাকরিটা চলে যাবে! রান্নাঘরের অন্ধকারে বসে কেবল সেই কথাটাই মনে হয়েছিল সেদিন। গঙ্গাও দেখা হতো না, বাবা বিশ্বনাথ দর্শনও হতো না। কেবল রান্না আর রান্না। কোথা দিয়ে দিন কাটতো রাত কাটতো বোঝা যেত না। রাত্রি-ভোর গরম জল করতে হতো কোনও কোনও দিন, গরম জলের সেঁক দিতে হতো মা-মণিকে। কুঞ্জবালা বলতো বুকে পিঠে ব্যথায় নাকি ছটফট করতো মা-মণি।

একদিন বোধহয় দুপুরবেলাই হবে।

—কে ওখানে?

ভারি গলার আওয়াজে ভয় পেয়ে ঘোমটাটা আরো টেনে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল মঙ্গলা। দেখতে কিছুই পায়নি। কে কথাটা বললে, কার গলা তা-ও বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল ওঁরা চলে গেলেই আড়ালে চলে যাবে।

আর একজন বুঝি কাকে জিজ্ঞেস করলে—আমি তো চিনিনে, ও কে গো?

থরথর করে কেঁপে উঠেছিল সমস্ত শরীরটা। তারপর মনে হয়েছিল যেন ভারী দু'মণ একটা পাথর বুক থেকে আস্তে আস্তে নেমে গেল।

কুঞ্জবালা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে এসে হাজির। বললে—হ্যাঁ লা, কী করেছিস, সর্বনাশ বাধিয়ে বসেছিস?

—কেন?

—কর্তাবাবুর সামনে পড়ে গিয়েছিলিস্ একেবারে?

কর্তাবাবু! কর্তাবাবুর গলা তবে ওই রকম। গলাটাই শুধু শুনেছে, আর কিছু চোখেও পড়েনি, কানেও যায়নি।

মনে হলো এখনি গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে লাজ-লজ্জা সব যেন ডুবিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। এমন সর্বনাশেও মানুষ পড়ে! কর্তাবাবুর দুপুরবেলা ওদিকে যাওয়ার কথা তো নয়। সাধারণত খেয়ে-দেয়ে তিনি দুপুরবেলা ঘুমোতেন একটু। সেই ঘুমের সময়টায় সমস্ত বাড়ি ঝিমঝিম করতো। গঙ্গার হাওয়া এসে মাঝে মাঝে ঝাপ্‌টা দিতো জানলা-দরজায়। তখন কুঞ্জবালাও কাছে থাকতো না, কেউ-ই কাছে থাকতো না। সমস্ত একতলাটা খাঁ-খাঁ করতো। একটা হিন্দুস্থানী সকালে বিকেলে বাসন-কোসন মেজে দিয়ে চলে যেত। তারপর সব অন্ধকার, সব ঝাপসা। একতলার সমস্ত আবহাওয়াটা একটা গুমোট গরমে যেন জড়োসড়ো হয়ে পড়ে থাকতো চারপাশে। ভিজে কাপড় টাঙানো থাকতো গলিটাতে। সেই ভিজে কাপড় এতটুকু নড়তো না। এতটুকু হেলতো-দুলতো না। একটা টিকটিকি সারাদিন সারারাত মাথার ওপর দেয়াল থেকে দেয়ালে চরে বেড়াতো, নড়ে বেড়াতো—আর মাঝে মাঝে চুপ করে চেয়ে থাকতো নিচের দিকে। মঙ্গলার দিকে। সব কাজ শেষ করে মঙ্গলারও যেমন কোনও কাজ থাকতো না, টিকটিকিটারও বুঝি কাজ থাকতো না কিছু। দু'জনে দু'জনার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতো। তারপর বিকেল হতো, কলে জল আসতো, রান্না চাপাতো উনুনে। কর্তাবাবু ওপরে থাকতেন। তাঁর জুতোর আওয়াজ, কাশির আওয়াজ পাওয়া যেত, তামাকের ধোঁয়ার গন্ধও নাকে এসে লাগতো। কিন্তু আর চোখে কখনও পড়েননি তিনি।

বিকেলবেলা বেলফুলওলা আসতো। এসে হাঁকতো দরজার বাইরে —বেল-ফুলওয়ালা—

হাঁক শুনে পীরজাদাই গিয়ে কর্তাবাবুর জন্যে ফুলের বরাদ্দ নিয়ে

আসতো। ফুলের বরাদ্দও যেমন ছিল, রাবড়ির বরাদ্দও তেমনি ছিল। আর ছিল সিদ্ধির বরাদ্দ। সিদ্ধি-বরফওয়ালা রোজ আসতো রাত দশটার সময়। সে-ও দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁকতো—বরোফ্—

আর তারপর ছিল গান। গানের কথা বোঝা যেত না। হিন্দুস্থানী মাগীরা কি যে গান গাইত, কোথায় বসে যে গাইত, তা-ও জানতো না মঙ্গলা। সুর করে দল বেঁধে গান তাদের। সেই সকালবেলাই তাদের গান শুরু হতো। কুঞ্জবালা বলতো—আটা পিষতে পিষতে ওরা গান গায়—

আর ছিল গঙ্গার দিকে যাত্রীর ভিড়। সকালে বিকেলে পেছনের গলি দিয়ে কত লোক যে যেত! ভোরবেলাই আরম্ভ হতো। তখন রাত বেশ। রাত থাকতে-থাকতে গান গেয়ে-গেয়ে চলতো সব—অনেক লোকের পায়ের শব্দ শোনা যেত ভেতর থেকে। আর মাঝে মাঝে হাঁকতো—জয় বাবা বিশ্বনাথ—জয় বাবা বিশ্বনাথ!

একদিন কুঞ্জবালাকে জিজ্ঞেস করেছিল—এতদিন কাশীতে এলুম, একদিন বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করতে পারবো না দিদি?

কুঞ্জবালা বলেছিল—কাশী তো পালিয়ে যাচ্ছে না তোর—যাবো একদিন তোকে নিয়ে—

প্রথম প্রথম কর্তাবাবু বেশ কাটাচ্ছিলেন। রোজ রোজ নৌকোয় বেড়াতেন।

কর্তাবাবু বলেছিলেন—কাশীতে এলাম, কাশীর সানাই শুনলাম না—

সানাই-এর ব্যবস্থা হয়েছিল দু-একবার। তা সানাই কী রকম বেজেছিল তা টের পায়নি মঙ্গলা। শুধু খাবার-টাবার তৈরি করে দিতে হয়েছিল মঙ্গলাকে।

কুঞ্জবালা বলেছিল—নৌকোর ওপর সানাই বাজবে, সে আর কী শুনবি তুই?

কোথা থেকে সেদিন কত কে এল গেল তা জানা যায়নি। কর্তাবাবু আর মা-মণি। মা-মণিও গিয়েছিল। কুঞ্জবালা সারাদিন ধরে পান সেজে সেজে ডিবে ভর্তি করেছিল। সাত সের ময়দার লুচি ভেজেছিল একলা মঙ্গলা। লুচি আর আলুভাজা। সঙ্গে রাবড়ি আছে, মালাই আছে। আরো কী কী সব মিষ্টি খাবার দোকান থেকে ফরমাশ দিয়ে এনেছিল। সবাই যখন ফিরে এসেছিল তখন রাত অনেক। একলা বাড়িতে থাকতে ভয় করেছিল খুব।

শিশুর-মা তাই মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতো—তা একবছর ছিলে কাশীতে বামুনদি, আর বাবা বিশ্বনাথের চরণ-দর্শন হলো না—?

ওদিকে লাউঘণ্ট রান্না হচ্ছে একটা উনুনে, এদিকে একটাতে ডাল আর একটাতে বড়বাবুর মাছের ঝাল।

—বড়বাবু আর দুটো আলুভাজা চাইছেন বামুনদি—

—চাল-কলের ম্যানেজারবাবু আজ খাবে না শিশুর-মা, পেটের অসুখ হয়েছে।

—কী গো, ভাত হয়েছে ? সকাল-সকাল খাবে আজকে বৌ-মণি!

একটা তাল সামলাতে সামলাতে আরো দশটা তাল এসে ঘাড়ে চেপে বসে। একটা উনুন সামলাতে গিয়ে আর একটা উনুনের রান্না পুড়ে যায়।

শিশুর-মা'র এক-একটা ফরমাশ ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক এক রকম!

—কালকে বড্ড ঝাল হয়েছিল ডালে, আজকে লঙ্কা দিয়ো না বামুনদি।

ভেতর-বাড়ি থেকে আবার হঠাৎ তখুনি ফরমাশ হয়—ডালে কাল ঝাল হয়নি কেন গো, বামুনদি কি লঙ্কা দিতে ভুলে গেছে ?

—ভাতে এত কাঁকর কেন থাকে গো ?

—কে তরকারি কুটেছে শুনি আজ, আলুর খোসা ছাড়ায়নি!

আজ কুড়ি বছর আগের সে-সব দিনের কথা ভাবতে কেন কেমন

লাগে ! সেই নৌকোয় চড়ে বেড়াতে গেল বাবুরা। কর্তাবাবু গেলেন, মা-মণি গেলেন। সানাই-ওয়ালারা গেল। মা-মণি গাড়িতে গিয়ে নৌকোয় উঠলেন। মস্তবড় দোতলা-ঘর-ওয়ালা নৌকো। কুঞ্জবালা সঙ্গে ছিল। কুঞ্জবালার সঙ্গে পানের ডিবে ছিল। মা-মণি পান খেতে লাগলেন। নৌকো ছাড়া হলো। সেই মাঝগঙ্গায় নৌকো ভাসতে-ভাসতে চললো—সানাই শুরু হয়েছে নৌকোর মাথায়। কর্তাবাবু নৌকোর মাথায় বসে তামাক খেতে খেতে সানাই শুনছেন। নৌকোও ভেসে চলেছে। একটার পর একটা রাগ বাজানো হচ্ছে। বেহাগটা একবার শুনলেন, পুরিয়া দু'বার, কিন্তু দরবারী কানাড়াটা বার বার—

কর্তাবাবু বললেন—বাজাও বাজাও—ফিন্ বাজাও—

হুজুরের ভাল লেগেছে। সঙ্গে লুচি আছে, রাবড়ি আছে, মিষ্টি খাবার আছে। সবাই খেলে, খেয়ে-দেয়ে আবার বাজনা চলতে লাগলো। মা-মণি অত বাজনা-টাজনা সুর-ফুর বোঝেন না।

বললেন—বেশ বাজাচ্ছে না রে কুঞ্জবালা—

কুঞ্জবালা বললে—খুব ভালো লাগছে মা-মণি আমার—

মা-মণি বললেন—তিনশো টাকা নগদ নিয়েছে, ভালো বাজাবে না ? কর্তাবাবু যাচাই করে নিয়েছে যে—

রাত বোধ হয় তখন ন'টা। বেশ ছিল। কর্তাবাবুও বেশ খোস-মেজাজে বাজনা শুনছিলেন—হঠাৎ মেঘ করে এলো দক্ষিণ দিকে। দেখতে দেখতে মেঘ ছড়িয়ে পড়লো আকাশে। দু'ফোঁটা জল পড়লো কর্তাবাবুর গায়ে। তখন হুঁশ হলো। চমকে উঠলেন তিনি। উঠে পড়লেন। সানাইও থামলো। ছাতি-টাতি কিছু নেই। বললেন—ঘাটে ভিড়োও নৌকো—

নৌকো ঘাটের দিকে ভিড়তে লাগলো। কিন্তু তখন মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে।

অসময়ের বৃষ্টি, কিন্তু তা বলে একটুতে থামলো না। একেবারে তুমুল জোরে নামলো। ' নৌকো তখন দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। ছাত ফুটো ছিল নৌকোর। ফুটো দিয়ে জল পড়তে লাগলো। মা-মণি ভয় পেয়ে গেলেন। নৌকো না উল্টে যায়। শেষ পর্যন্ত নৌকো অবশ্য উল্টোয়নি। কিন্তু সে-বৃষ্টি আর থামলো না সে রাতে। সমস্ত জামা-কাপড় ভিজে অবস্থায় কর্তাবাবু আর মা-মণি যখন বাড়ি এলেন তখন অনেক রাত।

সদর দরজায় কড়াকড় কড়া নড়ে উঠলো।

কর্তাবাবু বললেন—ভেতরে কে আছে রে ?

সরকারবাবু বললে—মঙ্গলা—

—মঙ্গলা কে ?

—হুজুর, আমাদের রান্নার কাজের লোক !

দরজাটা খুলে দিয়েই মঙ্গলা আড়ালে সরে গিয়েছিল। কুঞ্জবালা তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে হারিকেন নিয়ে এসে সামনে ধরলো।

কিন্তু মা-মণির শরীরে তখনই কাঁপন ধরেছে। সেই অত রাত্রে আবার জল গরম হয়, তেল গরম হয়। পায়ে গরম তেল সেঁক দিয়ে মা-মণি শুয়ে পড়লেন। কিন্তু পরদিন জ্বর এলো। প্রবল জ্বর। জ্বরের ঝোঁকে মা-মণি প্রলাপ বকতে শুরু করলেন।

গুরুদেব সকালবেলাই এলেন। বললেন—ডাক্তার আছে এখানে, কিন্তু কবিরাজ ডাকাই ভালো, আমি ভালো কবিরাজ পাঠিয়ে দেব—

কুড়ি বছর আগের ঘটনা। তখনও ওই দত্তক গ্রহণ হয়নি। মা-মণির সব মনে আছে। মনে আছে তিনি মাসের পর মাস শুয়ে থাকতেন সেই বিদেশে। সান্নিপাতিক ব্যাধি। নড়াচড়া নিষেধ। খালি কলকাতা থেকে লোক যায় আর আসে। কর্তাবাবু কাশী ছেড়ে নড়তে পারেন না।

গুরুপুত্র বললেন—আপনি তখন সেই রোগশয্যায়, সেই অবস্থাতেই ঘটনাটা ঘটলো---

—কোন্ ঘটনা ?

গুরুপুত্র বললেন—বলছি.—এ-সব কথা বাবা মৃত্যুর আগে সব আমাকে বলে গেছেন--

নেহাত দৈব। দৈব-দুর্ঘটনা বলা যায়। প্রথম প্রথম কর্তাবাবু মা-মণির বিছানা ছেড়ে উঠতেন না। শেষে রোগ পুরোনো হলো। কিন্তু দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই অচৈতন্য অবস্থায় কাটতো। ক্রমে ক্রমে কর্তাবাবু আবার নিজের বসবার ঘরে এসে বসতে শুরু করলেন। ওপর থেকে সামনের গঙ্গা দেখা যায়। সেই গঙ্গার ওপর নৌকোগুলো ভেসে যায় দক্ষিণ দিকে। মাঝে মাঝে গুণ টানতে টানতে যায় রামনগরের কোল ঘেঁষে। তারপর কলকাতার চিঠি দু'একটা পড়তে লাগলেন। এতদিন হাত দেননি কোনও কাজে। এবার কথাবার্তা বলতে লাগলেন, খাওয়া-দাওয়ায় রুচি এল। একদিন বললেন—পীরজাদা, আজকে একটু সিদ্ধি বাটতে বল ওদের---

বহুদিন ও-সব চলেনি। কলকাতা ছাড়ার পর বরাবর মা-মণিই সামলে-সামলে নিয়ে চলেছেন। এখন যেন কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগলো।

একদিন বললেন—সিদ্ধিটা বড় পাতলা করে ফেলে কেন—রাবড়ি কম দিয়ে একটু মসলা বেশি দিতে পারে না—

বেশি মসলাই দেওয়া হলো। মা-মণি তখনও অচৈতন্য।

বাবা বিশ্বনাথের মাথায় তখন গুণে গুণে বিল্বপত্র চড়ানো হচ্ছে। প্রথমে কম-কম। পাণ্ডাঠাকুর রোজ এসে প্রণামী নিয়ে যায়। তারপর একশো আটে উঠলো। তারপরে দু'শো ষোল। হোম চললো চব্বিশ প্রহর ধরে। বারোজন পাণ্ডাঠাকুর হোমের তদারক করতে লাগলো। ব্রাহ্মণ-ভোজন হলো তিনশো আটচল্লিশ জনের।

কর্তাবাবু বললেন—এবার সিদ্ধিতে নির্ঘাৎ ভেজাল মেশাচ্ছে কেউ, সে 'তার' নেই কেন রে?

রান্নায় ভুল ধরেন। বলেন—কালিয়াতে গরম-মসলা দেয়নি বে রে? কে রেঁধেছে?

কুঞ্জবালা খাওয়ার পাশে আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—একটু কম দিয়েছে হয়তো।

কর্তাবাবু খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লেন। বললেন—এ রান্না খাওয়া যায় না—

হাত ধুতে ধুতে বললেন—রান্না করে কে আজকাল?

—মঙ্গলা।

কর্তাবাবুর বরাবরের অভ্যেস খাওয়ার পরে একটু শুয়ে ঘুমোনো। পান চিবুতে চিবুতে তামাক খেতে খেতে একটু ঘুমোতেন। তখন পাখা ঘুরবে মাথার ওপর। কাশীর বাড়িতে তখন ইলেকট্রিক হয়নি। পাখা হাতে নিয়ে কর্তাবাবুর খাস-বরদার পীরজাদা পাশে দাঁড়িয়ে হাওয়া করতো। তারপর ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে তামাক চাই। তখন কবিরাজ মশাই এলে ভেতরে আসতেন।

কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কেমন দেখলেন?

কবিরাজ বললেন—সান্নিপাতিক ব্যাধি, একটু সময় নেবে, সমস্ত বুকটায় কফ বাসা বেঁধেছে—

একদিন দুপুরবেলা ঘুম থেকে কর্তাবাবু উঠলেন। বললেন—আগে শরবতটা দে—

তামাকও তৈরি ছিল, শরবতও তৈরি ছিল। খাস-বরদার শরবত দিলে।

শরবত খেয়ে বললেন—তুই এখন যা—

খাস-বরদার চলে গেল। খাস-বরদার এমন ছুটি কোনদিন পায় না। কিছু কাজ না থাকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কর্তাবাবু নিচে

নামলেন। খাস-বরদারও পেছন পেছন এলো। আড়ালে আড়ালে পেছনে আসতে লাগলো। মাঝ-দুপুর, বাইরে খাঁ খাঁ করছে রোদ। সারা কাশী শহরটা বুঝি ঝিমোচ্ছে। গঙ্গার জলে রোদ লেগে পিছলে যাচ্ছে বার বার। কিন্তু ভেতরটা ঠাণ্ডা। মোটা মোটা দেয়াল। স্যাঁতসেঁতে। সোঁদা-সোঁদা গন্ধ। ভ্যাপসা ভাব।

মা-মণিকে বেদানার রস খাইয়ে পাশে কুঞ্জবালাও একটু ঝিমিয়ে পড়েছে তখন।

কলঘরের ভেতরে ঢুকে মাথাটায় বেশ ভালো করে জল দিলেন। ঠাণ্ডা হলো মাথাটা। কেন যে এরকম হলো কে জানে। ঠাণ্ডা জল চাইলে পীরজাদা এনে দিত হাতের কাছে। সিদ্ধিটায় বোধহয় বেশি মশলা দেওয়া হয়েছিল। উঠে কলতলা থেকে বেরিয়ে আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাচ্ছেন। হঠাৎ দেখলেন রান্নাঘরের সামনে ঠাণ্ডা মেঝের ওপর আঁচলটা বিছিয়ে কে যেন শুয়ে আছে। শুয়ে আছে তো শুয়েই থাক্। অন্যদিন হলে এমন ঘটনা দেখেও দেখতেন না। পুতুলমালার কথা মনে পড়লো। কিন্তু হঠাৎ নজরে পড়লো পায়ের গোছটা। দু'পায়ের ফরসা সুপুষ্ট গোছ। নেশাটা বোধহয় একটু মাত্রা ছাড়িয়েছিল।

অভ্যাসমতো বলে ফেললেন—কে ?

পীরজাদা সামনে এগিয়ে এল। বললে—হুজুর, ধরবো আপনাকে ?

কর্তাবাবু থমকে উঠলেন। বললেন—ও কে ?

থতমত খেয়ে পীরজাদা বললে—হুজুর, মঙ্গলা।

সেই চেঁচামেচিতেই ততক্ষণে ঘুম ভেঙে গেছে মঙ্গলার। তাড়াতাড়ি কাপড়টা গুছিয়ে নিতে গিয়ে এখানকার কাপড় ওখানে সরে গেল, ওখানকার কাপড় এখানে সরে এল। সে এক লজ্জাকর ব্যাপার। কাপড় ঠিক করে উঠে রান্না ঘরের ভেতর ঢুকে দুইহাতে বুকটা চেপে ধরলো। বুকটা তখন ধড়াস ধড়াস করছে।

এসব অনেক বছর আগেকার কথা। তারপর অনেক জল অনেক জল গড়িয়ে নিয়ে গেছে। অনেক সময়ের দাগ কালের নিয়মে মুছে গেছে, আবার অনেক দাগ নতুন করেও লেগেছে সময়ের বুকে। সব মনে নেই, সব মনে ছিলও না। প্রায় একটা বছর যেন ঘূর্ণি-ঝড়ের মতো সমস্ত ওলোট-পালোট করে দিয়েছিল। গিয়েছিলেন এক মাসের জন্যে, কিন্তু হয়ে গেল এক বছর। এক বছর পরে ফিরে এলো সবাই। এসে দত্তক নেওয়া হলো। সেই দত্তক পুত্রের বিয়েও দেওয়া হলো। কিন্তু মঙ্গলা সেই যে এসেছিল কাশী থেকে আর যায়নি। কুঞ্জবালা একদিন মারা গেল। কুঞ্জবালার বুড়ি-মা-ই রাঁধতো। মেয়ে মারা যাবার পর বুড়ী আর থাকলো না। মঙ্গলা রান্নাঘরে ঢুকলো সেই থেকে।

যে দেখলে সে-ই বললে—এ কী গো, কী চেহারা হয়েছে তোর মঙ্গলা?

জগত্তারণবাবু বললেন—কেমন কাটালেন কর্তাবাবু!

ত্বলালহরিবাবু বললেন—আপনি চলে গিয়েছিলেন, একেবারে অনাথ হয়ে গিয়েছিলুম আমরা কর্তাবাবু—

কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—ন্যুলো মল্লিক আর গণ্ডগোল বাঁধায়নি তো?

জগত্তারণবাবু আর ত্বলালহরিবাবু ত্বজনে পালা করে পাহারা দিয়েছিল পুতুলমালার বাড়িতে। পুরুষ মাছিটি পর্যন্ত ঢুকতে পেত না।

জগত্তারণবাবু জিজ্ঞেস করলেন—খাওয়া-দাওয়ার তেমন অসুবিধে হয়নি তো সেখানে?

ত্বলালহরিবাবু জিজ্ঞেস করলেন—রান্নার তো নতুন লোক নিয়ে গিয়েছিলেন—

কর্তাবাবু বললেন—হ্যাঁ—

খাস-বরদারকে জগত্তারণবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কি রে, কর্তাবাবু কী করতো রে সেখানে ? কী করে কাটাতো তোর কর্তাবাবু ?

পীরজাদা বললে—আজ্ঞে, সিদ্ধির শরবত খেতেন খুব—পেস্তা বাদাম দিয়ে তৈরি করে দিতুম—

—খুব খেতেন, না ? রোজ ক' গেলাস ?

—কোনও কোনও দিন তিন-চার গেলাসও হতো ?

—তাহলে তুইও বেটা তো খুব খেয়েছিস !

পীরজাদা জিভ কাটলো—না হুজুর, কী যে বলেন আপনারা !

জগত্তারণবাবু জিজ্ঞেস করলে—শুধুই সিদ্ধি ? আর ইয়ে টিয়ে—

খাস-বরদার বুঝতে পারলে ইঙ্গিতটা। তবু বললে—ইয়ে-টিয়ে মানে ?

দুলালহরিবাবু বললে—তুই বেটা জাঁহাবাজ আছিস ! কর্তাবাবু সেই মানুষ কিনা, একটা বছর একেবারে নিরম্বু কাটিয়েছে বলতে চাস্ ? গিন্নী তো অসুখে পড়ে—

খাস-বরদারও তেমনি ছিল কর্তাবাবুর। কোনও কথা তার মুখ দিয়ে বার করা যেত না। ঘুষের পয়সা নিত। কিন্তু ভেতরের কথা কিছু বলতো না। একটু একটু বলতো শুধু।

একদিন মহা বিপদ। মা-মণির সেদিন শ্বাস ওঠবার অবস্থা। বাড়িময় অস্থিরতা। কর্তাবাবুর দিবানিদ্রা হলো না। তিনি ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। বার দুই শরবত খেলেন। তাতেও তেষ্টা গেল না। বললেন—আরো এক গেলাস বানা—

ডাক্তার চৌধুরী দেখছিলেন তখন। কবিরাজী ছেড়ে অ্যালোপ্যাথি হচ্ছে তখন। বাড়ি তখন হাসপাতাল হয়ে গেছে। ওষুধে ডাক্তারে দিনরাত সরগরম। হঠাৎ অসুখটার বাড়াবাড়িতে ডাক্তাররাও ভয় পেয়ে গেলেন। সামান্য বৃষ্টিতে ভিজে এই এত কাণ্ড হবে ভাবতে পারা যায়নি।

তখন সন্ধ্যে হয়েছে। ডাক্তার চৌধুরী বললেন—এখন ভালো বুঝছি না, রোগী দুর্বল হয়ে পড়েছেন, রক্ত দিতে হবে—

—কার রক্ত ?

ডাক্তার চৌধুরী বললেন—বেশ সুস্থ কোনও লোকের রক্ত চাই—

আর কে আছে ? কার রক্ত হলে চলবে ? সেই অল্প সময়ের মধ্যে কাকেই বা আর যোগাড় করা যায়, স্বজাতি শুধু হলেই চলবে না। কর্তাবাবু বললেন—কিন্তু আমার গুরুদেবের অনুমতি নিতে হবে এ-সম্বন্ধে—

গুরুদেব এলেন। বললেন—আমার যজমানদের মধ্যে কারো সন্ধান করতে হবে—

কর্তাবাবু বললেন—আমার স্ত্রী ধর্মশীলা, ডাক্তারবাবু, যার-তার রক্তে তাঁর রক্ত অপবিত্র হতে পারে,—

গুরুদেব বললেন—আমি এখনি সব ব্যবস্থা করে আসছি—

ডাক্তার চৌধুরী বললেন—কিন্তু যা কিছু সব আজ রাত্রেই করে ফেলতে হবে, রোগীর অবস্থা বিশেষ খারাপ—

গুরুদেব বাইরে বেরিয়েছেন। ঘরের বাইরে, অন্ধকারে তেলের আলোটা টিমটিম করে জ্বলছিল মাথার ওপর। সেই আলোতে পথ দেখে সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতেই একেবারে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চেহারাটা অন্ধকারে অস্পষ্ট। ময়লা একটা শাড়ি পরে রান্নাঘর থেকে ভাঁড়ার ঘরে যাচ্ছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন।

বললেন—কে তুমি ?

কুঞ্জবালা কাছেই গরম জল নিয়ে ওপরে যাচ্ছিল। সে বললে—ও মঙ্গলা—

গুরুদেব কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর যেদিক দিয়ে এসেছিলেন সেই সিঁড়ির দিকেই উঠে গেলেন আবার। তারপর

কর্তাবাবুকে গিয়ে কানে কানে বললেন—একজনকে পেয়েছি, ডাক্তার-বাবুকে একবার দেখাতে হবে—

কর্তাবাবু বললেন—কে ?

ডাক্তার চৌধুরী সেদিন অনেক রাত্রে বাড়ি গেলেন! শুধু রক্ত দেওয়া নয়। সেই রাত্রে অনেক ক্রিয়াকর্ম অনেক অনুষ্ঠান ঘটে গেল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। মা-মণি তখন বিছানায় অজ্ঞান অচৈতন্য। অনেক আর্তনাদ, অনেক আশঙ্কা, অনেক অশান্তির সমাধি ঘটে গেল সেই রাত্রেই, সেই কাশীর পুরোনো বাড়িটার চার দেয়ালের মধ্যে। কেউ জানতে পারলো না মা-মণির জীবনদানের জন্যে কার রক্তের কী সংমিশ্রণ ঘটে গেল।

মা-মণি বললেন—তার পর ?

সমস্ত বাড়িটার মধ্যে এখন নিথর নিস্তব্ধতা। খোকাও নেই, সে গেছে বাইরে। জগত্তারণবাবু সঙ্গে গেছে, নফরও সঙ্গে আছে। সে থাকলে অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘরে আলো জ্বলে। খাস-বরদার পাঁচুও জেগে থাকে। এ-মহলে ও-মহলের কোনও শব্দ কানে আসার কথা কথা নয়। তবু মা-মণির ঘুম আসে রাত্রে। রাত্রে শিয়রের জানলাটা খুলে দিলে খোকার ঘরটায় আলো জ্বলছে দেখা যায়। তারপর জগত্তারণবাবু এক সময়ে চলে যায়, খাস-বরদার পাঁচু দরজা বন্ধ করে দেয়, আর তারপরে একসময়ে আলোও নিভে যায় খোকার ঘরের।

সকালবেলা বৌ-মণির ঘরের সামনে গিয়ে ডাকেন—বৌমা ?

বৌ-মণি এসে দাঁড়ায়। বলে—আমায় ডাকছিলেন মা!

—কাল খোকা ঘরে এসেছিল ?

এ প্রসঙ্গ আলোচনা করতে বৌ-মণির লজ্জা হয়। বলে—উনি তো আসেন নি—

মা-মণি বলেন—কিন্তু ঘরের আলো তো সকাল-সকাল নিভে গিয়েছিল ?

খাস-বরদার পাঁচুকে ডাকেন। জিজ্ঞেস করেন—কাল খোকা ঘুমোতে আসেনি কেন ভেতরে ?

পাঁচু বলে—আমি বলেছিলুম বড়বাবুকে ভেতরে আসতে।

মা-মণি বলেন—তা তুই কেন ভেতরে নিয়ে এলি না ডেকে ?

পাঁচু বললে—বড়বাবু শুয়ে পড়লেন ফরাসের ওপর, তাই মশারি খাটিয়ে দিলুম আমি ওখানেই—

মা-মণি বললেন—আজ ভেতরে ডেকে আনবি, বুঝলি ? না হলে তুই আছিস্ কী করতে ?

তারপর বৌ-মণিকে বলেন—বৌমা, তুমি একটু শক্ত হতে পারো না ?

বৌ-মণি মাথা নিচু করে থাকেন। শাশুড়ীর সামনে কোনও কথা বলতে পারেন না মাথা তুলে।

বৌ-মণির সমস্ত রূপ সমস্ত গুণ যেন এ-বাড়িতে এসে দিন দিন জৌলুসহীন হয়ে যাচ্ছে। প্রথম প্রথম ভেবেছিলেন রূপসী বউ, বাইরের নেশা দু'দিনেই কেটে যাবে। হোক বংশের নেশা। তবু তো খোকার সঙ্গে এ-বংশের রক্তের সম্পর্ক নেই। কোন্ গ্রামের কোন্ এক অখ্যাত বংশের ছেলে। মা-মণি কাশী থেকে ফিরেই খোঁজ নিতে আরম্ভ করেছিলেন। বেশ ভালো সৎ বংশ হলেই চলবে। এ-বংশের রক্তের দোষ যার শরীরের ত্রিসীমানায় নেই। কর্তাবাবু তখন আবার জগত্তারণ-বাবুর সঙ্গে বাড়িতে যেতে শুরু করেছেন।

একদিন রাত্রেই সোজাসুজি কথাটা পাড়লেন মা-মণি।

বললেন—তোমাকে দেখতে হবে একবার—

কর্তাবাবু বললেন—আমি আর দেখে কী করবো ?

মা-মণি বললেন—সৎ বংশ, বাপ-মা সৎ-চরিত্র—কোনও খুঁত নেই—

কর্তাবাবু বললেন—আর কিছুদিন সবুর করো না, এত তাড়াহুড়ো কেন? আমি তো মরছি না এখুনি?

মা-মণি বললেন—আমি তো মরতে পারি?

কর্তাবাবু বললেন—মরার কথা উঠছে কেন এখন?

—বাঁচা-মরার কথা কে বলতে পারে? আমি তো মরতে বসেছিলুম সেদিন!

কর্তাবাবু বললেন—বাবা বিশ্বনাথের দয়ায় যখন বেঁচেছ তখন আর কেন ও-কথা তুলছো?

মা-মণি বললেন—তবু তোমায় দেখতেই হবে আমি মনস্থির করে ফেলেছি—

কর্তাবাবু বললেন—কোথায় সে?

মা-মণি বললেন—এখানেই রেখেছি, তোমাকে দেখাবো বলে—

কর্তাবাবু কী যেন ভাবলেন—আর কিছুদিন থাক্ না, আমিই না-হয় দেখেশুনে একটা যা-হোক কিছু স্থির করবো!

সকালবেলা মা-মণি ছেলেটিকে আনালেন। ছোট ফুটফুটে ছেলে। বাপ নেই। অবস্থা খারাপ। বিধবা মায়ের তিনটি সন্তান। মা-মণি তাঁদের আনিয়েছেন নিজের পৈতৃক গ্রাম থেকে। দূরের একটা সম্পর্কও আছে। তিনটি সন্তান নিয়েই এসেছে মা। পুরোহিতমশাই দেখেছেন। জন্ম-পত্রিকা করে পরীক্ষাও করেছেন তিনি। কোনও আপত্তি নেই কারো। কিন্তু কর্তাবাবু যেন কেমন মন-মরা। সেদিন আর বাগানবাড়ি গেলেন না। জগত্তারণবাবু দুলালহরিবাবু সবাই এসে নিচের বৈঠকখানায় অনেকক্ষণ বসে রইলেন।

পরমন্তকে একবার ডেকে জিজ্ঞেস করলেন জগত্তারণবাবু—হ্যাঁরে, কর্তাবাবুর কী হলো, শরীর খারাপ?

পরমন্ত বললে—কর্তাবাবু মা-মণির ঘরে।

—মা-মণির ঘরে এতক্ষণ কেন রে বাবা ? কিসের এত পরামর্শ ?

ভেতরের ঝি-দাসী মহলেও যেন অনেক ফিস্‌ফাস্ চলতে লাগলো। সে-সব অনেকদিন আগেকার কথা। তখন ওই জগত্তারণবাবুও জানতে পারেননি কিছু। ওই দুলালহরিবাবুও জানতে পারেননি কিছু। অবশ্য দুলালহরিবাবু আর বেশিদিন বাঁচেননি। একদিন পুতুলমালার বাড়ির সামনের পুকুরে তাঁর মৃতদেহও ভেসে উঠেছিল। কিন্তু সে অন্য গল্প। আসলে কেউ কিছু জানতে পারেনি। কারা ছেলেপুলে নিয়ে ক'দিন ধরে বাড়িতে রয়েছে। তাদের জন্যে আপ্যায়ন-আয়োজনও প্রচুর। সবাই সজাগ। তাদের জন্যে মিষ্টি আসছে। ছোট ছেলেটির জন্যে জামা আসছে, কাপড় আসছে।

কিন্তু বেলা যখন দেড় প্রহর, হঠাৎ কাশী থেকে লোক এল। ভূষণ সিং দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। ময়লা কাপড়, সারা রাত ট্রেনে চড়ে এসেছে। সঙ্গে একটা ছোট ছেলেও—

জগত্তারণবাবু বৈঠকখানায় বসে ছিলেন। দুলালহরিবাবুও বসেছিলেন হা-পিত্যেশ করে। ভেতর থেকে কোনও খবর আসছে না। কর্তাবাবুর তখন সময় নেই নিচে নামবার। মা-মণির সঙ্গে তখন কথাবার্তা হচ্ছে ঘরের ভেতর। সকাল থেকে খাওয়া নেই দাওয়া নেই। দু'জনেই ব্যস্ত।

রান্নাবাড়িতে শিশুর-মা খাবার নিয়ে বসে আছে।

—হ্যাগা বামুনদি, আজ কর্তাবাবু যে এখনও খাবার চায়নি ?

মঙ্গলা নিজের মনেই রাঁধছিল।

শিশুর-মা আবার বললে—কর্তাবাবুতে আর মা-মণিতে কী যে কথা হচ্ছে ঘরের ভেতর, আজ খাওয়া-দাওয়া নেই নাকি কারো—

জগত্তারণবাবু বললেন—ভাগিয়ে দাও, ভাগিয়ে দাও ওকে ভূষণ—

দুলালহরিবাবুও বললেন—কোত্থেকে এসেছে ও ?

জগত্তারণবাবু বললেন—কোত্থেকে এসেছে মরতে কে জানে—শুনেছে এখানে মধু আছে তাই এসেছে—

ভূষণ সিং বলেছে—না না, এখানে কিছু হবে না—ভাগো হিঁয়াসে—

নফরের সে-সব কথা মনে নেই। তখন সে ছোট। দেড়-বছর দু-বছরের ছোট্ট ছেলেটা। এখান থেকে হাঁটতে-হাঁটতে গঙ্গার ধারে যাত্রীদের বিশ্রাম করবার ঘরে বসে ছিল অনেকক্ষণ। বেলা গড়িয়ে গেল। তখনও কোথায় যাবে ঠিক নেই, লোকটা ল্যাবেনচুষ কিনে দিয়েছিল এক পয়সার। চেটে চেটে জিভ লাল করে ফেলেছে। তারপর খিদের জ্বালায় কখন ঘুমিয়েও পড়েছে।

কর্তাবাবু একবার দু'বার লোক পাঠিয়েছেন বাইরে। পয়মন্তকে বললেন—দেখে আয়তো, কাশী থেকে কেউ এসেছে কিনা—সঙ্গে একটা ছোট্ট ছেলে আছে দেখিস্—

পয়মন্ত ফিরে এসে বলেছিল—কই, কেউ তো আসেনি আজ্ঞে—

আরো দু'একবার পাঠিয়েছিলেন দেখতে। বেলা দুটো পর্যন্ত দেখা হলো, কেউ এল না।

তারপর অনুষ্ঠান আরম্ভ হলো। কুল-পুরোহিত অনুষ্ঠান-ক্রিয়া আরম্ভ করলেন। হোম হলো যজ্ঞ হলো। সামান্য করে শুধু আরম্ভটা হয়ে গেল। মা-মণি আর কর্তাবাবু গরদের জোড় পরে দত্তক সন্তান গ্রহণ করলেন। ছোট্ট ফুটফুটে চেহারার ছেলে। মাথা নেড়া করা হয়েছে। মা-মণি তাকে নিজের কোলে তুলে নিজের হাতে খাওয়ালেন অনুষ্ঠানের শেষে।

সবশেষে কর্তাবাবু কাজকর্ম সেরে বাইরে এসেছেন।

জগত্তারণবাবু দুলালহরিবাবু এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন।

বললেন—ভালোই হলো কর্তাবাবু, সন্তান না হলে কি গৃহ মানায়! ভালোই করেছেন—

সন্তানের নতুন নাম রাখা হলো সুবর্ণনারায়ণ। কুলপদবী সেন। সুবর্ণনারায়ণ সেন।

জগত্তারণবাবু বললেন—এবার একদিন পঙ্‌ক্তি-ভোজন হয়ে যাক্ কর্তাবাবু, সেন-বংশের বংশধর হলো, ইতরজন কেন বাদ পড়ে যায়—

ঠিক হলো পরে একদিন অনুষ্ঠান হবে। সেদিন আত্মীয়-স্বজন অভ্যাগত সকলকে নিমন্ত্রণ করা হবে। সেদিনই সবাই নতুন সন্তানের মুখ দেখবে, আশীর্বাদ করবে।

কিন্তু হঠাৎ সন্ধ্যের দিকে কর্তাবাবু বাইরে আসতেই কে যেন এগিয়ে এল সামনে। ভেবেছিলেন ভিখিরীদের কেউ হবে। কিন্তু লোকটা তাঁর পায়ের ধুলো নিলে।

কর্তাবাবু চেয়ে দেখলেন। বললেন—কে ?

—আমি কাশী থেকে এসেছি হুজুর।

কর্তাবাবু কথাটা শুনেই যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—এনেছ ?

লোকটা বললে—এই দেখুন হুজুর—এই যে—নফর—

হাত ধরে ছেলেটাকে সামনে এনে দাঁড় করালো।

—কী নাম রেখেছ এর ?

—আজ্ঞে নফর বলে ডাকি আমরা।

নফর !

কর্তাবাবু বললেন—তা এত দেরি হলো কেন আসতে ?

—আজ্ঞে এসেছিলাম সকালবেলা, তখন আপনি ব্যস্ত ছিলেন। তাই একটু ঘুরে এলাম।

নফর তখন কর্তাবাবুর কোটের বোতাম নিয়ে খেলা করছে। কর্তাবাবু ছেলেটার গাল টিপে দিলেন। বললেন—চালাক হয়েছে খুব—না ?

—আজ্ঞে, খুব চালাক, ওর জ্বালায় সবাই অস্থির, বড় হলে খুব বুদ্ধি হবে ওর দেখবেন—

কর্তাবাবু বললেন—আচ্ছা তুমি যাও—

বলে খাজাঞ্চিখানায় গিয়ে সরকারবাবুর কাছ থেকে পাঁচশো টাকা নিলেন। নিয়ে লোকটাকে দিলেন। বললেন—এই সব শোধ হয়ে গেল—

সরকারবাবু বললেন—কার নামে টাকাটা জমা করবো হুজুর?

কর্তাবাবু বললেন—কাশীতে যে-ঠিকানায় মনি-অর্ডার করে টাকা পাঠানো হতো, সেই দুর্গা-মন্দিরের নামে খরচা লিখে দিয়ো—

সরকার-মশাই টাকা পাঠিয়ে আসছেন বরাবর মন্দিরের ঠিকানায়। কর্তাবাবুর খরচে দুর্গা-মন্দিরের সংস্কার হচ্ছে। সেই খরচাতেই আরো পাঁচশো টাকা যোগ হয়ে গেল।

কর্তাবাবু বললেন—আসছে মাস থেকে আর পাঠাতে হবে না টাকা, এই শেষ কিস্তি শোধ হয়ে গেল সব।

এর পর আর বেশিদিন বাঁচেননি কর্তাবাবু। তখন নতুন সন্তান এসেছে বাড়িতে, তার তদারকেই ব্যস্ত সবাই। মা-মণি বলতেন—দেখিস, খোকার ঠাণ্ডা লাগে না যেন?

হঠাৎ হয়তো কেঁদে উঠেছে খোকা। মা-মণি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

—হ্যাঁরে সিন্ধু, খোকা কাঁদছে কেন?

সিন্ধুমণি এসে বলে—নফরটা মেরেছে ওকে—

—নফর? নফর কে?

সিন্ধুমণি বলে—আজ্ঞে, ওই-যে একটা ছোঁড়া জুটেছে কোত্থেকে, বার-বাড়িতে থাকে আর খেলা করে খোকাবাবুর সঙ্গে?

—তা তোরা আছিস কী করতে? দেখতে পারিস না, যে-সে এসে মারামারি করে!

আর ঠিক সেই থেকেই কর্তাবাবুর শরীরটা ভেঙে গেল যেন। এখানে ওখানে যেতেন। গাড়িতে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বাগানবাড়িতেও

যেতেন। কিন্তু কিছুতেই শান্তি পেতেন না। সিদ্ধিটা শুরু হয়েছিল কাশী থেকে, সেটা ওখানেও এসে চলেছে। ক্রমে আরো বেড়েছে।

মা-মণি বলতেন—খোকার জন্যে লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করছো না, মুখ্যু হয়ে থাকবে নাকি!

কর্তাবাবু বলতেন—এই বয়েস থেকেই লেখাপড়া?

—এখন থেকে না করলে যে কিছুই শিখবে না, একটা ভালো মাস্টার রাখো না—

মাস্টার! বললেন—জগত্তারণবাবু পড়াতে পারে, বি-এ পাস—

তারপর একটু থেমে বললেন—তাহলে ওরা দু'জনেই একসঙ্গে পড়ুক—

—দু'জন আবার কোথায় পেলে? দু'জন কে?

—খোকা আর নফর।

মা-মণি বললেন—আমার ছেলের সঙ্গে নফর পড়বে, কোথাকার কে ঠিক নেই, তার লেখাপড়া নিয়ে যত মাথা-ব্যথা—ও কে?

কর্তাবাবু সে-কথা এড়িয়ে যেতেন। বলতেন—ঘাড়ে এসে পড়েছে, যদি মানুষ হতে পারে তো হোক না—

সেই ছোটবেলা থেকেই বড় বায়না করতো নফর। হৈ-চৈ বাধিয়ে চীৎকার করে একেবারে বাড়ি মাৎ করে ফেলতো। বলতো—ওর জুতো হয়েছে, আমার কই?

খাজাঞ্চিবাবু বলতেন—ওর যা হবে তোরও তাই হবে নাকি! তুই কে রে!

নফর রেগে যেত। বলতো—আমি কেউ না?

কর্তাবাবুর কানে যেত সে গোলমাল।

বলতেন—তা ওকেই বা জুতো কিনে দেয়না কেন?

উঠতে পারতেন না শেষের দিকে। কিন্তু কানে আসতো। খাজাঞ্চি-

বাবুকে ডাকতেন কাছে। বলতেন—ও যা চায়, ওকে দিয়ো তুমি, জানলে—

—আজ্ঞে হুজুর, খোকাবাবুর সঙ্গে সমানে সমানে সব চাইবে।

আজ গাড়ি, কাল খেলনা, পরশু জামা-কাপড়। মা-মণির হুকুমে নতুন নতুন জিনিস আসে বাজার থেকে। খোকাবাবুর জন্যে কোনও জিনিস আর আসতে বাকি থাকে না। নফর দেখতে পেলে কেড়ে নেয়। সিন্ধু বলে —এই ছোঁড়া, বেরো এখান থেকে—বেরো—দূর হ—

নফরও তেমনি। বলে—বেরোব কেন ?

—বেরোবি না তো, থাকবি এখানে ? এখন খোকাবাবু খাবে!

—আমার খুশী আমি থাকবো। তোর কী! আমিও খাবো, আমার বুঝি ক্ষিদে পায়না ?

সিন্ধুমণি গালে হাত দেয়।

—ওমা, শোনো ছোঁড়ার কথা! তোর ক্ষিদে পায় তো তুই রান্না-বাড়িতে যা না—

নফর বলতো—তাহলে খোকন এখেনে খাবে কেন ?

—ও হলো বাড়ির ছেলে, তুই কে রে ছোঁড়া ?

নফর রেগে গেল। বললে—তুই ছোঁড়া বলছিস কেন রে মাগী আমাকে ?

বলে এক চিমটি কেটে পালিয়ে যেত নফর।

কিন্তু কর্তাবাবু মারা যাবার পরই যেন জেদ বেড়ে গেল নফরের। কথায় কথায় রেগে যায়। কথায় কথায় ক্ষেপে ওঠে। ও ইস্কুলে যায়, নফরও ইস্কুলে যাবে। বড়বাবুকে জগত্তারণবাবু পড়ায়, নফরও পড়বে। খোকাবাবু তখন ছোট। সেই বয়েসেই একদিন ঝগড়া বাধলো। তুমুল ঝগড়া। লাট্টু নিয়ে। নফর খোকাবাবুর লাট্টু চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। খোকাবাবু গিয়ে লাট্টু চাইতেই নফর এক ঘুষি মেরেছে।

কান্নায় বাড়ি ফাটিয়ে ফেলেছে খোকাবাবু।

—কী হলো রে, কী হলো ?

বাড়িসুদ্ধ লোক দৌড়ে এসেছে নফরের ঘরে। রক্ত বেরোচ্ছে তখন খোকাবাবুর নাক দিয়ে।

—কে মেরেছে রে ? কে মেরেছে ওকে ?

নফর বললে—আমি।

—তুই ! এত বড় আস্পর্দা তোর—খোকাবাবুকে মারিস ?

ব'লে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিয়েছে কেউ নফরের গালে। তারপর আদর করে কোলে তুলে নিয়ে গিয়েছে খোকাবাবুকে। কিন্তু নফর তবু কাঁদেনি চড় খেয়ে। গুম হয়ে বসে থেকেছে কিছুক্ষণ। তারপর সোজা গিয়েছে রান্নাবাড়িতে। চোৎপাট করেছে। বলেছে—ভাত দাও আমাকে শিশুর-মা—আমার ক্ষিদে পেয়েছে—

তার সমস্ত আঘাত যেন সে ভাত খেয়ে ভুলে যেতে চাইত।

শিশুর-মা-ও হেঁকে দিত—বেরো এখন থেকে, সকালবেলা ভাত কিসের রে ? পরে আসিস্—

তারপর কবে একদিন বিয়ে হয়ে গিয়েছে বড়বাবুর। কবে নতুন বউ এসেছে। বয়েস বেড়েছে, শরীরও বড়বাবুর ভারী হয়েছে। জগত্তারণবাবু রোজ এসেছে বড়বাবুর সঙ্গে গল্প করতে—নিঃশব্দে নির্বিবাদে সব কখন ঘটে গেছে কারোর তা মনে নেই। নফরেরও মনে নেই। একতলার অন্ধকার ঘরখানার মধ্যে শুয়ে শুয়ে কখন ফুটো দিয়ে তার সব অধিকারের অনিবার্যতাটুকু নিঃশেষ হয়ে গেছে তা নিয়েও আর নফর মাথা ঘামায় না। এখন ওই বড়বাবু একটু ডাকলেই তৃপ্তি, কুকুরের মতো ল্যাজ নাড়তে নাড়তে গিয়ে আবার পুরোনো দিনের কিছুটা অংশ ফিরে পায়—

কেউ আর জিজ্ঞেস করে না—ও কে গো ?

এখন আর রান্নাবাড়িতে গিয়ে ঝগড়া করে না।

বললো—মাছ দাওনি কেন ? আমি এ-বাড়ির কেউ নই ?

নফর এখন ভাত খেয়ে চুপি চুপি আবার নিজের ঘরের ঘুপ্‌চির ভেতর এসে শুয়ে পড়ে। কোথায় বড়বাবুর কী জামা-কাপড় হলো, কী খেলে, কিছুই খেয়াল রাখে না। টিকটিকিটা শুধু মাথার ওপর লাল চোখ দিয়ে তার দিকে মাঝে মাঝে হাঁ করে চেয়ে থাকে, আর নিচে নফর ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়—

এ-সব ইতিহাস পুরোনো। বর্তমান সেন-বংশের বাঁধা ইতিহাসের পাতা খুঁজলে এমন অনেক অধ্যায় পাওয়া যাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে থেকে শুরু করে এই বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত অনেক গ্লানি, অনেক কলঙ্ক অদৃশ্য ফলকে লেখা হয়ে আছে। সে আর কেউ জানতে পারবে না। জানা উচিতও নয়, কাম্যও নয়।

শ্যাওলা-ধরা বাড়িটার সামনে থেকে তেমন কিছু বোঝা যাবে না। যখন এ-পাড়ায় আর কোনও বাড়ি ছিল না, এ-সব তখনকার কাহিনী। এখন এ-পাড়ায় সামনে পেছনে অনেক বাড়ি হয়ে গেছে। আশেপাশে আগে মাঠ ছিল, বন-জঙ্গল ছিল। তখন এ-বাড়ির আভিজাত্য ছিল। দশজন সমীহ করতো, ভয় করতো, ভক্তিও করতো হয়ত।

এখন এ-বাড়ি ও-বাড়ি সকাল-সন্ধ্যেয় রেডিও বাজে। মটর আসে, বেরিয়ে যায়। ভাড়াটেও এসেছে কত। ঘুড়ি উড়তে উড়তে এ-বাড়িতে ঢুকে পড়লে ছেলেরা নির্ভয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। দরোয়ান বিশেষ কিছু আর বলে না এখন। সবাই জানে বড়লোকের বাড়ি এটা, কিন্তু জানে না এর ভেতরে কতগুলো লোক থাকে, কী তারা করে, কী করে তারা জীবন কাটায়, কী জন্যে তারা বেঁচে আছে—

কিন্তু আজ পাড়ার লোক সব ভেঙে পড়লো এ-বাড়ির সামনে—

এতদিন এ-বাড়ির দিকে কেউ বিশেষ নজর দিত না। বিরাট বাড়ি।

সামনের দিকের জানালা দরজা সব সময় প্রায় বন্ধই থাকতো। বাড়ির সামনের গাড়ি-বারান্দার ওপর নিম-গাছটা ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে অনেক ঝড় অনেক বাদল এতকাল ধরে সয়ে এসেছে নির্বিবাদে। দেয়ালের শ্যাওলাতে অনেক লতাপাতা জ'ন্মে ঝোপ জঙ্গল হয়ে গেছে। লোকে জানতো ভেতরে যারা বাস করে তারা বনেদী ঘরের লোক—কেউ তাদের কখনও দেখতে পাবে না। চন্দ্র-সূর্য ও তাদের দেখতে চেষ্টা করলে হার মানবে।

কিন্তু আজ আর কিছু অজানা থাকবে না। আজ বোধ হয় সব জানাজানি হয়ে যাবে। সামনের চায়ের দোকানের ছোঁড়ারাও দৌড়ে এসেছে, ধোপাপাড়া থেকেও দু'একজন দৌড়ে এল। একটা খালি রিক্সা যাচ্ছিল সামনে দিয়ে—রিক্সাওয়ালাটাও থমকে দাঁড়ালো।

বললে—কেয়া হুয়া বাবু ?

আর, বাড়ির ভেতরের যারা তাদের মধ্যেও যেন আজ সব ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। বড়বাবুর ঘর খালি। খাস-বরদার পাঁচু বড়বাবুর সঙ্গে গাড়ির মাথায় চড়ে চলে গেছে। সেদিক থেকে কোনও সাড়াশব্দ নেই। ফুলমণি রাত থাকতে উঠে বার-বাড়ির বাসন মেজেছে। পয়মন্তু সিঁড়ির দরজা খুলে দিয়েছে। সিন্ধুমণি বারান্দায় পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল। কলতলায় বাসনের আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে গেছে। ধড়মড় করে উঠে মা-মণির ঘরের দিকে গিয়ে দেখলে—মা-মণি তখনও ওঠেনি। অন্যদিন সিন্ধুমণি ভেতর-বাড়িতে সকলের আগে ওঠে—কুঞ্জবালা বড় দেরি করে উঠতো। বড় ঘুম-কাতুরে মানুষ ছিল সে। মা-মণির কাছে শুনেছে।

কাশীতে যেবার কুঞ্জবালা গিয়েছিল, দিনরাত ঘুমোত।

একদিন কর্তাবাবুর পায়ে ধাক্কা লেগে গিয়েছিল। তারপর থেকে কুঞ্জবালা মা-মণির ঘরের মেঝেতে শুতো। যখন অসুখ হলো মা-মণির, দিনরাত সেবা করতে হতো, তখন দিনেও জাগতে হতো রাত্রেও জাগতে

হতো। একদিন কুঞ্জবালা বলেছিল—কলকাতায় গিয়ে পেট ভরে ঘুমোব—

তা কুঞ্জবালার সেই ঘুমের জন্যই বোধহয় ওই সর্বনাশ ঘটে গিয়েছিল।

সিন্ধুবালা জিজ্ঞেস করেছিল—কিসের সর্বনাশ দিদি ?

—সে তোর শুনে কাজ নেই লা।

—কেন, শুনলে কী হবে দিদি ?

তখন অনেক রাত। কর্তাবাবু সিদ্ধি চড়িয়েছেন দুপুরবেলা। সেই শরবতের নেশাতেই ঝিম্ হয়ে ছিলেন সমস্ত দুপুর, সমস্ত বিকেল। খাস-বরদারও তখন একটু ঝিমোচ্ছিল। বিকেলের দিকে মা-মণি একটু ভালোই ছিলেন, কিন্তু মাঝরাতে হঠাৎ মা-মণি কেমন করতে লাগলেন। মুখ-চোখের ভাব দেখে ভালো মনে হলো না। কুঞ্জবালা গিয়ে খাস-বরদাকে ডাকলে—শুনছিস্—অ্যাই—

কর্তাবাবুর খাস-বরদার উঠলো অনেক ডাকাডাকিতে।

কুঞ্জবালা বললে—কর্তাবাবুকে ডাক, মা-মণি কেমন করছে—

খাস-বরদার বললে—কর্তাবাবু যে ঘুমোচ্ছে, ডাকবো কী করে ?

কুঞ্জবালার রাগ হয়ে গিয়েছিল।

—তুই ডাক না মুখপোড়া! বল্, মা-মণি কেমন করছে—

এদিকে মা-মণি কেমন করছে, চোখের মণি যেন উল্টে যাবার যোগাড়, আর পাশের ঘরে কর্তাবাবুরও পাত্তা নেই। ঘরে বিছানা ঠিক পাতা আছে, কিন্তু বিছানায় মানুষ নেই। খাস-বরদার এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলো। নেশার ঘোরে কোথাও কর্তাবাবু চলে গেল নাকি! গঙ্গার দিক বরাবর দরজাটা বন্ধ ছিল—সেটা বন্ধই রয়েছে—। বারান্দার এ-কোণ ও-কোণ দেখা হলো। কোথাও নেই—কোথায় গেলেন কর্তাবাবু ?

সে-সব দিনের কথা যারা জানতো, যারা হাজির ছিল তারাই জানে।

ডাক্তার চৌধুরী বললেন—কিন্তু দেরি করলে চলবে না, যা করবার শিগ্‌গির করতে হবে—

ডাক্তার চৌধুরী ভালো করে মঙ্গলাকে দেখলেন।

মন্ত্রপড়া ছাগলের মতো থরথর করে কাঁপছিল তখন মঙ্গলা। সারা গায়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। পাশেই খাটের ওপর মা-মণির দেহ নির্জীব হয়ে পড়ে আছে। ডাক্তার চৌধুরী খানিকটা রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন। কী তিনি দেখলেন তিনিই জানেন।

গুরুদেব কর্তাবাবুকে আড়ালে ডাকলেন—

বললেন—এক বংশের রক্তের সঙ্গে আর এক বংশের রক্তের মিশ্রণে শাস্ত্রীয় বাধা-বিরোধ আছে, তা আগে দূর করতে হবে—

কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কী করে দূর হবে?

গুরুদেব বললেন—উপায় আছে—যদি আপনার আপত্তি না থাকে—

—কী উপায়? আমার কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই—

সে-রাত্রে যে কী হলো! ভাগ্যের সেই অমোঘ নির্দেশের মধ্যে ভাগ্য-দেবতার বোধহয় কোনও গভীর উদ্দেশ্য ছিল। সেদিন কর্তাবাবুও বোধহয় কল্পনা করতে পারেননি তাঁর সেই কৃতকর্মের ফলাফল একদিন এত ভারী হয়ে আর এতদিন পরে তা এতবড় বিপর্যয় ঘটিয়ে দেবে।

সমস্ত রাতটা মা-মণির কেমন করে কেটেছে ভগবানই জানেন।

গুরুপুত্র বেশীক্ষণ রইলেন না।

ট্রেন আসার কথা ছিল সন্ধ্যেবেলা। সেই ট্রেন এলো রাত দশটায়। তারপর ভোরবেলাই আবার রওনা দিতে হবে। বললেন—আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো না, আমাকে ভোরবেলাই রওনা দিতে হবে—

আগামী সোমবার অর্ধোদয়-যোগে আমাকে কাশীধামে উপস্থিত থাকতেই হবে—বাবার ক্রিয়াকর্ম সব বাকি রয়েছে—

মা-মণি পায়ের কাছে কেঁদে পড়লেন।

বললেন—তার পর ?

তারপর সেই রাত্রেই কর্তাবাবু নতুন ধুতি পরে তৈরি হয়ে নিলেন। মঙ্গলাও বেনারসী শাড়ি পরলে, ঘোমটা দিলে। বাড়ি থেকে দূরে আর-একটা বাড়িতে অনুষ্ঠানের আয়োজন তখন সম্পূর্ণ হয়েছে। মঙ্গলাকেও নিয়ে যাওয়া হলো। রাত তখন অনেক।

পুরোহিত মন্ত্র পড়লেন—

ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম,

যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।

কর্তাবাবু উচ্চারণ করলেন—

প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভির-

স্থীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্।

প্রাণে প্রাণে অস্থিতে অস্থিতে মাংসে মাংসে এবং চর্মে চর্মে এক হয়ে যাক্।

গোত্রান্তর আগেই হয়েছে। তারপর বিবাহ। বিধবা-বিবাহ। কাশীধাম দেবতার ধাম। শাস্ত্রীয় বিধান মেনে মা-জননীর পুনর্জীবন-লাভের জন্যে বিবাহ। এ চলে। এতে অন্যায় নেই, এতে দেবতার নিষেধ নেই, সম্মতিই আছে বরং। গুরুদেবের সমর্থনও আছে।

কর্তাবাবু বললেন—কিন্তু কেউ যেন এ খবর জানতে না পারে—

একরাত্রের ব্যাপার। লোকচোখের অগোচরেই সব সমাধা হয়ে গেল। কেউ-ই জানতে পারলো না। মঙ্গলা যথারীতি ফিরে এল অনুষ্ঠানের শেষে। আবার বেনারসী শাড়ি ছেড়ে ফেললে। আবার মঙ্গল-চন্দন মুছে ফেললে।

ডাক্তার চৌধুরী ছুঁচ ফুটিয়ে দিলেন শরীরে। ঘোমটার আড়ালে মঙ্গলা একটু কেঁপে উঠেছিল বুঝি ভয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সেইখানেই।

—তার পর ?

শুধু কি একদিন ! শুধু কি দু'দিন ! কতবার রক্ত নেওয়া হলো। তখনও মা-জননীর আরোগ্য হয়নি। কর্তাবাবু কিন্তু রাত্রে কোথায় বেরিয়ে যান, যখন অনেক রাত। গভীর রাত্রে কর্তাবাবুর জন্যে পাল্কী আসে। আবার ভোরের দিকে ফিরে আসেন। তখন ডাক্তার আসে। মা-মণির অসুখের খবর নেন। তারপর দুপুরবেলা তাঁর গভীর নিদ্রা। বেলা চারটের সময় সে-ঘুম ভাঙে—তখন তাঁর জন্যে শরবত তামাক সব তৈরি রাখে খাস-বরদার—

কিন্তু দিনের বেলা কাজ করতে বেশ ঢুলুনি আসতো মঙ্গলার।

কুঞ্জবালা জিজ্ঞেস করতো—কী হয়েছে রে তোর, বসে বসে ঢুলছিস্ কেন !

মঙ্গলা সেদিন পা জড়িয়ে ধরলো। বললে—আমার সব্বনাশ হয়েছে, আমি আর বাঁচবো না—

—কেন, কী হলো ?

পরের দিন থেকে মঙ্গলাকে কোথায় নিয়ে গেলেন কর্তাবাবু। দুর্গা-মন্দিরের ভোগ রাঁধতে হবে, সেখানেই মঙ্গলা থাকবে কিছুদিন। বাড়িতে রাঁধবার জন্যে অন্য লোক এল। কাশীর হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। রান্না ভালো, কিন্তু ঝাল-মশলার বেশি হাত।

তা তাই নিয়েই চালাতে হলো। দুর্গা-মন্দিরের ভোগ রাঁধতে গেল মঙ্গলা। কুঞ্জবালা তা-ই জানে। তা-ই জানলো সবাই। তখনও মা-মণির অসুখ ভালো হয়নি। আস্তে আস্তে গায়ে একটু বল পেলেন। তখন প্রায় বছর দেড়েক কেটে গেছে।

জিজ্ঞেস করলেন—কুঞ্জ ?

কুঞ্জ তাড়াতাড়ি মা-মণির মুখের কাছে মুখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী মা-মণি ?

—কর্তাবাবু কোথায় ?

কুঞ্জবালা বললে—ডাকবো ? কর্তাবাবু তামাক খাচ্ছেন—

—একটু জল দে—

কুঞ্জবালা জিজ্ঞেস করলে—এখন কেমন আছো মা ?

মা-মণি মাথা নাড়লেন। ভালো না।

একদিন মা-মণি বললেন—আর ওষুধ খেতে পারি না—

ওষুধ খেয়ে খেয়ে তখন অরুচি ধরে গেছে তাঁর। চেহারা শীর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম-প্রথম লোক চিনতে পারতেন না। কর্তাবাবু পাশে এসে দাঁড়ালেও কী-সব প্রলাপ বকতেন। মাথায় ঘোমটা দেবার প্রয়োজন মনে করতেন না। যে মা-মণি প্রত্যেকদিন কর্তাবাবুর পাদোদক না খেয়ে জলগ্রহণ করতেন না, সেই তাঁরই কত মতিভ্রম হতে লাগলো। মুখের কাছে ওষুধ নিয়ে গেলে দাঁত বন্ধ করে থাকতেন, গায়ে জোর থাকলে ওষুধ ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। সমস্ত বাড়িতে তখন লোকজন ভরে গেছে। কলকাতা থেকে আরও চাকর-ঝি এসে গেছে। বরফ আসছে, কলকাতা থেকে ট্রেনে করে ডাব আসছে! কাশীধামে সব ওষুধ পাওয়া যায় না। কলকাতা থেকে আনতে হয়। ডাক্তার চৌধুরী আসতেন, তাঁর সঙ্গে আসতেন ডাক্তার সান্ন্যাল। কর্তাবাবুর হুকুম ছিল রোজ এসে তাঁরা দেখে যাবেন।

শেষে একদিন ভাত খাবার অনুমতি দিলেন ডাক্তারবাবু।

বললেন—বেশ পাতলা ঝোল—সিঙ্গি-মাছের ঝোল, আর সরু পুরোনো সেদ্ধ-চালের ভাত—

প্রথম দিন ভাত মুখে দিয়ে কিন্তু রুচি হলো না।

বললেন—মঙ্গলা এ কী রেঁধেছে ?

কুঞ্জবালা বললে—মঙ্গলা নয় মা, একটা হিন্দুস্থানী বামুন রেঁধেছে—

—কেন ? মঙ্গলা কোথায় গেল ?

কুঞ্জবালা বললে—মঙ্গলা নেই তো মা !

—কোথায় গেল সে !

কুঞ্জবালা বললে—দুর্গাবাড়িতে ভোগ রাঁধে সে আজকাল—

—কেন ? সেখানে কেন গেল ?

—কর্তাবাবু বলেছেন !

মা-মণি বললেন—কর্তাবাবু কোথায় ? ডাক্‌তো—

কর্তাবাবু আসতেই মা-মণি মাথায় ঘোমটা তোলবার চেস্টা করলেন।

বললেন—মঙ্গলাকে দুর্গাবাড়ির ভোগ রাঁধতে পাঠিয়েছ তুমি ?

কর্তাবাবু বললেন—কেন, তোমাকে কে বললে ? রান্না কি ভালো হয় না ?

—আজকে খেতে পারলাম না।

কর্তাবাবু কী যেন ভাবলেন।

মা-মণি বললেন—তুমি ওকে নিয়ে এসো, ওকে আমি নিজে বলে বলে রান্না শিখিয়েছি—ও-ই এখেনে রাঁধবে।

কর্তাবাবু বললেন—আজকে কেমন আছো ?

মা-মণি বললেন—ও কথা থাক্—বরং তুমি কেমন আছো বলো !

কর্তাবাবু বললেন—তোমার শরীর খারাপ, আমি কি করে ভালো থাকবো ?

মা-মণি বললেন—কাশীতে আমিই তোমাকে আনলুম, আমার জন্যেই তোমার এই কস্ট—

কর্তাবাবু বললেন—কস্ট যে সার্থক হয়েছে এইটেই সান্ত্বনা—

মা-মণির চোখ যেন ছলছল করে উঠলো।

বললেন—একটা দিন কি একটা মাস হয় তা-ও না-হয় সহ্য হয়, এ একবছর ধরে শুয়ে শুয়ে আর পারি না—

—এতদিন সহ্য করেছ আর কিছুদিন সহ্য করো!

মা-মণি বললেন—মরে গেলেই ভালো হতো—

কর্তাবাবু বললেন—ও-কথা কেন বলছো?

—তোমার পায়ে মাথা রেখে মরবো, সিঁথির সিঁদুর নিয়ে যেতে পারবো, কাশীধামে মরবো, এমন সৌভাগ্য কি আমার হবে?

কর্তাবাবুর কথা বাড়ির সকলেরই মনে আছে। বাগানবাড়ি যেতেন বটে, জগত্তারণবাবু দুলালহরিবাবু তারাও যেত, ফুর্তি হতো, মাইফেলও হতো, তবু যেন কর্তাবাবু কোথায় যেন ছিলেন সত্যিকারের সংসারী মানুষ! বাগানবাড়ি গিয়েও কখনও বাড়ির কথা ভুলে যাননি! সংসার করেছেন, ধর্ম করেছেন, আবাব মদও খেয়েছেন, বাগানবাড়িও রেখেছেন, এজন্যে মা-মণির কোনও ভয় ছিল না কোনওদিন, সন্দেহও ছিল না।

মা-মণি বলতেন—এমন স্বামী ক'জন পেয়েছে আমার মতো? অনেক তপস্যা করলে এমন মানুষ মেলে, বৌমা—

প্রতিদিন সকালবেলায় যখন কর্তাবাবু বাড়ি থাকতেন, কর্তাবাবুর পাদোদক না পান করে জলস্পর্শ করেননি তিনি।

বৌ-মণিকে বলতেন—তোমার শ্বশুরকে তুমি বেশিদিন দেখতে পাওনি বৌমা,—দেখলে বুঝতে পারতে কী মানুষ ছিলেন তিনি—দেবতুল্য মানুষ, অমন হয় না।

বৌ-মণি কিছু বলতেন না। চুপ করে শুনতেন শুধু শাশুড়ীর কথা।

মা-মণি বলতেন—এতদিন এসেছ, এখনো খোকাকে তুমি বশ করতে পারলে না, আর আমি?

একটু থেমে বলতেন—আমাকে না-জানিয়ে তিনি কিছু করতেন না

—বাগানবাড়ি যাবার আগেও আমাকে বলে যেতেন, এমনি মানুষ ছিলেন তিনি—মদ খেতেন তিনি, ছোটবেলার অভ্যেস, কিন্তু আমি বললে তা-ও বোধহয় ছাড়তে পারতেন—

কর্তাবাবু ভোরবেলা ঘুম থেকে দেরি করে উঠতেন। শেষের দিকে তিনি আর রাত্রে অন্দরে আসতেন না। নাচঘরেই রাত্রের শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম-প্রথম বিয়ে হবার প্রথমদিকে, একসঙ্গে এক বিছানাতেই শুতেন দু'জনে। সকালে উঠে মা-মণি রোজ কর্তাবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাতেন! তারপর বাইরে যেতেন।

একদিন দেখে ফেলেছিলেন। বললেন—পায়ের ধুলো নিচ্ছ যে হঠাৎ? কী হলো?

মা-মণি বলেছিলেন—আমি তো রোজই নিই—

—কেন নাও? আর নিয়ো না।

মা-মণি বলেছিলেন—তুমি আপত্তি কোরো না, হিন্দু স্ত্রীলোকের স্বামীই দেবতা—

কর্তাবাবু বলেছিলেন—আমি তা বলে দেবতা নই!

মা-মণি বলেছিলেন—ও কথা বোলো না, আমার কাছে তুমি দেবতাই—

কর্তাবাবু বলেছিলেন—কিন্তু আমার যে অনেক বদ রোগ আছে, রাত্রে মাঝে মাঝে বাইরে কাটাই, মদ খাই, তা জানো তো!

মা-মণি বলতেন—তা যা ইচ্ছে তোমার করো, তুমি আমার—

বড় গর্ব করেই সেদিন মা-মণি কথাগুলো বলেছিলেন। ভেবেছিলেন, সংসারের যেখানে আর যা কিছু ফাঁক থাকুক, ফাঁকি থাকুক, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে কোথাও কোনও গ্রন্থি থাকবে না—

তাই সেদিন যখন কর্তাবাবু বললেন মঙ্গলা দুর্গাবাড়িতে ভোগ রাঁধতে গেছে, তিনি বিশ্বাসই করেছিলেন।

কিন্তু মঙ্গলা তখন আর এক আঘাতে জর্জ্জর হয়ে রয়েছে। আর এক নিভৃত ঘরে শয্যাগ্রস্ত। সে-কথা কেউ জানে না।

কর্তাবাবু জানিয়ে দিয়েছেন—এ বিয়েও যেমন সাময়িক, এ সন্তানও তেমনি সাময়িক প্রয়োজনে—

কর্তাবাবুই টাকা দিয়েছেন, সেবা-শুশ্রূষা করবার লোক রেখেছেন, বাড়ি ভাড়া করবার খরচ দিয়েছেন। সুতরাং আবার সব মুছে ফেলতে হয়েছে। শরীরের ক্লান্তি, পেটের সন্তান, সিঁথির সিঁদুর, সব। টাকাও দিতে চেয়েছিলেন। যেখানে খুশী চলে যাও, তোমার সন্তান থাক্ তোমার কাছে, কারো কাছে কোনো পরিচয় প্রকাশ হতে পারবে না। পারলে, শাস্তি হবে সে-কথাটা আর খুলে প্রকাশ করা হয়নি।

কিন্তু সেদিন কর্তাবাবুর প্রস্তাবে মঙ্গলা 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বলেনি। শুধু মাথা নিচু করে থেকেছে।

মঙ্গলা আবার যেদিন এল বাড়িতে, কুঞ্জবালা চেহারা দেখে অবাক।

বললে—ওমা, কী চেহারা, ঠাকুরের ভোগ রেঁধে রেঁধে তোর চেহারার কী দশা হয়েছে রে মঙ্গলা—

মা-মনির ঘরে গিয়ে পায়ের ধুলোও নিয়ে এল।

মা-মণি বললেন—আমার বাড়ির ভোগ কে রাঁধে তার ঠিক নেই, তুই কিনা গেছিস্ দুর্গাবাড়িতে—

তারপর আস্তে আস্তে সেরে উঠলেন মা-মণি। পথ্য গ্রহণ করলেন, উঠে চলে-ফিরে বেড়াতে পারলেন। শেষকালে একদিন কাশীর পাট উঠলো।

কর্তাবাবু শেষের দিকে কেমন একটু কাতর হয়ে পড়েছিলেন।

কী যেন বলতে চাইতেন। কী যেন বলতে পারতেন না। কাশীবাসের পর থেকেই কেমন যেন অন্যরকম। বাগানবাড়িতে যাবার

আগ্রহ তেমন ছিল না। বন্ধু-বান্ধব আসতো, জগত্তারণবাবু আসতো, অনেকক্ষণ খবর দেবার পর তবে তিনি নিচে নামতেন।

গাড়িতে ওঠবার মুখে এক-একদিন দেখতেন ছেঁড়া নোংরা জামা পরে নফর এসেছে কাছে। বলেছে—একটা পয়সা দাওনা কর্তাবাবু—

জগত্তারণবাবু তাড়িয়ে দিত। বলতো—যা যা, বেরো এখান থেকে, পয়সা কী করবি রে ?

—ল্যাবেন্‌চুষ খাবো।

কর্তাবাবুর মুখখানা যেন কালো হয়ে আসতো!

ডাকতেন—পয়মন্ত—

পয়মন্ত কাছে এলেই বলতেন—এই একে খেতে দেয়না কেন বল্‌তো —একে কেউ খেতে দেয়না কেন ?

—আজ্ঞে খায় তো ও।

—তাহলে ল্যাবেন্‌চুষ খাবে বলছে কেন! আবার খেতে দিতে বল একে—রান্নাবাড়িতে বলে দিবি একে যেন পেট ভরে খেতে দেয়—আর ছাখ্‌ খাজাঞ্চিবাবুকে একবার ডাক্‌তো—

নফর ততক্ষণে কর্তাবাবুর পাঞ্জাবিতে ময়লা হাত লাগিয়ে কালো করে দিয়েছে।

খাজাঞ্চিবাবু খাতা ফেলে দৌড়তে দৌড়তে এলেন।

কর্তাবাবু বললেন—এ ছেঁড়া-জামা পরে থাকে কেন ? দেখতে পাও না ?

কালিদাসবাবু বললেন—আজ্ঞে, বড় ইতর ছোঁড়াটা, নতুন জামা দিতে-না-দিতে…

—তুমি থামো!

হুঙ্কার দিয়ে উঠতেন কর্তাবাবু।

বলতেন—খোকাবাবুর যখন জামা-কাপড় হবে, তখন এরও হবে, দেখবে যেন ন্যাংটা হয়ে আমার সামনে না আসে—

কর্তাবাবু চলে গেলে সবাই বলাবলি করতো—ছোঁড়াটা কে ?

মুহুরিবাবু বলতো—ছোঁড়াটা খুব বশ করেছে তো কর্তাবাবুকে—

কর্তাবাবু খেয়ে-দেয়ে নাচঘরে শুয়ে তামাক খাচ্ছেন দুপুরবেলা, খাস-বরদারও বোধহয় সেই সময়টা রান্নাবাড়িতে খেতে গেছে, হঠাৎ কোথা থেকে এক-পা ধুলো নিয়ে একেবারে কর্তাবাবুর ঘাড়ে চড়ে বসেছে—

—আরে, ছাড়্ ছাড়্—

নফরের তখন অন্য মূর্তি। গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে কেড়ে নিয়েছে। বলে—দেব না—

কর্তাবাবু বিব্রত হয়ে উঠেছেন।

—ওরে, কে আছিস, ছাখ্, ধর্ একে—

—তাহলে একটা পয়সা দাও—

—পয়সা কি করবি তুই ?

—ক্ষিদে পেয়েছে।

—তোকে কেউ খেতে দেয়না বুঝি ?

নফর পিঠে উঠে অত্যাচার শুরু করেছে তখন। মাথায় হাত দিয়ে চুল টানছে। এমন করে কর্তাবাবুর কাছে ঘেঁষতে কারো সাহস নেই। খোকাবাবু পর্যন্ত দূরে দূরে থাকে। কেমন লেখাপড়া হচ্ছে, শরীর কেমন আছে সব খবরই নেন, কিন্তু সে-ও এমনি করে কর্তাবাবুর পিঠে উঠতে সাহস করে না—

চুপি চুপি জিজ্ঞেস করেন—হ্যাঁরে, ভাত খেয়েছিস ?

নফর বুকের খুব কাছাকাছি শুয়ে বুকের চুলগুলো টানছে তখন।

বললে—হ্যাঁ—

—পেট ভরেছে ?

—না।

কর্তাবাবু হেসে ওঠেন। মিথ্যেকথা বলছে বুঝতে পারেন। মিথ্যেকথা বললেই আদর পাওয়া যাবে বুঝতে পেরেছে।

জগত্তারণবাবুকে জিজ্ঞেস করেন—খোকার কেমন পড়াশুনো হচ্ছে জগত্তারণবাবু ?

—আজ্ঞে ব্রেন্ আছে খোকাবাবুর, যা বলি টপাটপ বুঝে ফেলে।

—আর ও ?

—কে ?

যেন বুঝতে পারে না জগত্তারণবাবু। বললেন—কার কথা বলছেন ?

—ওই আমাদের নফর ?

জগত্তারণবাবু মুখ বেঁকায়।

—আজ্ঞে, ও ছোঁড়ার কিচ্ছু হবে না, মোটে মাথা নেই, কেবল খেলার দিকে ঝোঁক, ওর লেখাপড়া শিখে কিচ্ছু হবে না, ওটা গণ্ডমুখ্যু হয়ে কাটাবে দেখবেন।

—গণ্ডমূর্খ হবে ?

কর্তাবাবুর মুখটা যেন বিমর্ষ হয়ে এল। যেন বড় কষ্ট পেলেন কথাটা শুনে। মুখ কালো করে বললেন—পড়ে না মোটে ?

জগত্তারণবাবু বললে—পড়বে কি আজ্ঞে, মাথাতেই ওর ঢোকে না কিছু, মাথায় গোবর পোরা আর কি !

কর্তাবাবু বললেন—একটু ভালো করে চেষ্টা করে ছাখো না—হয়ত হতেও পারে, সকলের কি আর সমান মাথা হয় ?

জগত্তারণবাবু বললে—বৃথা চেষ্টা আপনার, তবে আপনি যখন বলছেন, দেখবো চেষ্টা করে—

খোকাবাবু আর নফর দু'জনকেই ইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো।

খোকাবাবু গাড়ি করে ইস্কুলে যেত। গুলমোহর আলি গাড়ি নিয়ে হাজির থাকতো। মা-মণি নিজে তদারক করে খোকাবাবুকে খাইয়ে-দাইয়ে ইস্কুলে পাঠিয়ে দিতেন। চাকর-বাকররা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতো সে-সময়টা। একটু যদি দেরি হয় তো মা-মণির বকুনির অন্ত থাকে না।

—দেখছিস খোকন এখন ইস্কুলে যাবে, তোরা কোথায় থাকিস সব ?

খোকাবাবু ইস্কুলে গিয়ে যেন সমস্ত বাড়ির লোকের মাথা কিনে নেবে।

নফর দেখতে পেয়েছে। দৌড়ে সে-ও গাড়িতে উঠতে যায়। একেবারে পা-দানিতে উঠে দাঁড়িয়েছে।

—আমিও গাড়ি করে ইস্কুলে যাব—

—ওরে থাম থাম !

গুলমোহর আলি আর একটু হ'লে গাড়ি চালিয়ে দিত। নেহাত থামিয়ে ফেলেছে ঠিক সময়ে। আবদুল পেছন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো।

—উতরো, উতরো তুম্।

নফর বললে—না, নামবো না—আমিও গাড়ি চড়বো।

গুলমোহর আলি শাসাতে লাগলো—বাবুকো বোলাও, জল্‌দি—

কিছুতেই কিছু হলো না। জোর করে নফরকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি গড়্গড় করে গড়িয়ে চলে গেল গেট্ দিয়ে। নফর রাগ করে ইস্কুলেই গেল না। সমস্তক্ষণ মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলো। তারপর কাঁদতে কাঁদতে একসময় কখন ঘুমিয়েও পড়লো।

এ-সব ছোটবেলাকার ঘটনা। তারপর কর্তাবাবু মারা গেছেন। মারা যাবার আগে ক'মাস আর নিচেও নামতে পারেননি। নফর ওপরে উঠতে গেছে। পরমন্ত খেঁকিয়ে উঠেছে—যা যা, বেরো এখন থেকে—

কর্তাবাবুর তখন অসুখ বেশ ঘরে কেউ নেই। পয়মন্তকে ডেকে বললেন—নিচে কে কাঁদছে রে?

—কই আজ্ঞে, কেউ তো কাঁদছে না—

—আমি যে শুনতে পেলুম। দেখে আয় দিকিনি?

পয়মন্ত বাইরে গেল। বাইরে থেকে উঁকি মেরে নিচেয় দেখলে। একবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। তিন মহল বাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে কত লোক বাসা বেঁধেছে। কত মানুষ পুরুষানুক্রমে অন্ন-সংস্থানের চেষ্টায় এ-বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে যুগ যুগ ধরে। কেউ ঠকেছে, কেউ ঠকিয়ে গেছে। কেউ মরেছে, কেউ মেরেছে। তবু এ-বাড়ির ইট, কাঠ, গাছপালা, শ্যাওলার মতো এ-বাড়ির সঙ্গে তারা আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থেকেছে—তাদের সকলের কোলাহল, সকলের চীৎকার, সকলের কান্না আর হাসির শব্দ যদি ধরে রাখা যেত তো এর ইতিহাস শুনে আজকের লোক চম্‌কে উঠতো, শিউরে উঠতো। কিন্তু কোথায় সব তলিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে। সে আর দেখা যাবে না, সে আর বুঝি শোনা যাবে না।

পয়মন্ত বলে—না হুজুর, কেউ তো কাঁদছে না—

—ওই রান্নাবাড়ির দিকে একটু কান পেতে শোন্ তো?

রান্নাবাড়ির দিকেও কান পেতে শুনেছে। কিন্তু সব চুপচাপ সেখানে। শিশুর-মা সেখানে শুধু তরকারি কোটে, বাটনা বাটে আর একটা-দুটো কথা বলে মঙ্গলার সঙ্গে। মঙ্গলা তার উত্তরই দেয় না।

—হ্যাঁ দিদি, তোমার তো ভাগ্যি ভালো, তবু বাবা বিশ্বনাথের চরণ দর্শন করেছ। আমাদের যে কী কপাল!

মঙ্গলা চুপ করে রান্না করে যায় চারটে উনুনে একসঙ্গে। ভাত ডাল ঝোল ফোটে টগ্ বগ্ করে। জল গরম হলে কেমন একটা সোঁ সোঁ শব্দ হয়। হাঁড়ির ভেতর মাংস রান্না হলে কেমন একটা গুম্ গুম্ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। আর মাঝে মাঝে বাইরের রোয়াকে শিশুর-মার শিল-

নোড়া ঘষার শব্দ। একটানা কাশীর গঙ্গার জলের সোঁ-সোঁ শব্দের মতো এ সর্বক্ষণ লেগেই আছে।

—ও বামুনদি, ওই ছাখো সেই ছোঁড়াটা খেতে এসেছে, আবার জ্বালাবে আজ!

নফর চীৎকার করে খেতে বসবার আগেই,—আজ যদি মাছ না দাও তো কর্তাবাবুর কাছে লাগাবো গিয়ে—

—দেব না তোকে মাছ, কী করতে পারিস দেখি আমি!

শিশুর-মা কোমরে কাপড় জড়িয়ে মারমুখো হয়ে আসে।

নফর বলে—মারবে নাকি তুমি?

—হ্যাঁ মারবো,—ছোঁড়ার মুখে আগুন, শুনলে বামুনদি ছোঁড়ার কথা, আবার মেয়েছেলের গায়ে হাত দিতে আসে—

নফর বলে—আমি তোমার গায়ে হাত দিতে আসিনি, তুমি থামো—

ব'লে ডাকে—বামুনদি—

মঙ্গলার বুকের ভেতরটা ধকধক করে ওঠে।

—কানে কথা যায় না বুঝি কারো?

একেবারে রান্নাঘরের দরজার কাছে এগিয়ে আসে নফর।

তারপর মঙ্গলার মুখের দিকে তাকিয়ে কী একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়। বলে—তোমার চোখে কী হলো গো বামুনদি? জল পড়ছে কেন গা?

মঙ্গলা ততক্ষণে জলটা মুছে নিয়েছে।

নফর বলে—কাঁচা তেলে ফোড়ন দিয়েছিলে তুমি? দেখি দেখি, চোখটা দেখি—

শিশুর-মা'র আর সহ্য হলো না। বললে—বেরো, ছোঁয়া-লেপা কাপড় নিয়ে রান্নাবাড়ি থেকে বেরো বলছি—নইলে ডাকবো ভূষণ দরোয়ানকে সেদিনের মতো, বেরো বলছি—

হাতে একটা লোহার বেড়ি নিয়ে তেড়ে এসেছে।

কি জানি ভূষণের নাম শুনেই বোধহয় ভয় পেলে নফর। রান্নাবাড়ি থেকে সুড়সুড় করে বেরিয়ে এল। তারপর বললে—দুত্তোর তোর ভাতের নিকুচি করেছে, ভাত দিবিনে তো বয়ে গেল, দেখি ভাত না খেয়ে থাকতে পারি কিনা—

শিশুর-মা'ও পেছপাও হয়। বলে—তাই ছাখ্ তুই—আমিও দেখি, এবার খেতে এলে খ্যাংরা-পেটা করবো এও বলে দিলুম—

কিন্তু আর কেউ না বুঝুক, কর্তাবাবু বুঝতে পারতেন।

বলতেন—ওই রান্নাবাড়ির দিকে একটু কান পেতে শোন্ তো?

পয়মন্ত এসে বলে—কই, রান্নাবাড়িতে তো সবাই চুপ, ওখানে তো কিছু গোলমাল নেই?

—গোলমাল নেই?

শেষের দিকে মা-মণি কাছে এলেই যেন একটা কী কথা বলতে চাইতেন। কী যেন বলতে চাইতেন, কী যেন বলতে সাহস পেতেন না!

মা-মণি বলতেন—কিছু বলবে তুমি?

কর্তাবাবু বলতেন—খোকা কোথায়?

—সে তো নিজের ঘরে রয়েছে, ডাকবো তাকে?

—না, তুমি বোসো একটু।

মা-মণি অনেকক্ষণ বসে রইলেন পাশে। মাথায় হাত দিয়ে টিপতে লাগলেন।

বললেন—কই, কী বলবে বলছিলে যে?

কর্তাবাবু বললেন—জমা-খরচের খাতা কে দেখছে আজকাল?

মা-মণি বললেন—খোকাকে আমি দেখতে বলেছি, মাঝে মাঝে খাজাঞ্চিখানায় বসে ছাখে—

—হলুদপুকুরের বন্ধকী সম্পত্তির মকদ্দমাটার কী হলো ?

মা-মণি বললেন—ও-সব দেখবার লোক রেখেছ তুমি, তারাই দেখছে, তুমি আর ও-সব নিয়ে ভেবো না—

—ওরা কি পারবে ?

—না পারলে না পারবে, তা বলে তোমাকে আর ভাবতে হবে না ও-সব।

কর্তাবাবু থেমে গেলেন। খানিক পরে বললেন—কাশী থেকে গুরুদেবকে একবার ডাকতে হবে—

—কেন ?

কর্তাবাবু বললেন—অনেকদিন আগে কাশী গিয়েছিলাম, তোমার অসুখ হয়েছিল খুব—খুব অসুখ—

মা-মণি বললেন—মনে আছে—

কর্তাবাবু বলতে লাগলেন—মনে তো থাকবেই, মনে তো থাকবেই, আমারও মনে আছে, মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারছি না, কেবল মনে পড়ছে—

—সে-কথা না-ই বা মনে করলে। আমি যে সেবার ভালো হয়েছি সে কেবল বিশ্বনাথের দয়ায়—

কর্তাবাবু আপত্তি করতে লাগলেন—না গো না, বিশ্বনাথের দয়ায় নয়, বাবা বিশ্বনাথের দয়ায় নয়, সবই ভবিতব্য,—

সেদিন মা-মণি খাস-বরদারকে জিজ্ঞেস করলেন—কর্তাবাবু কেমন আছেন রে ?

খাস-বরদার বললে—বাবু চিঠি লিখছিলেন মা—

মা-মণি ঘরে ঢুকলেন। বললেন—এই শরীরে আবার চিঠি লিখছিলে! কোথায় এমন চিঠি লেখবার দরকার হলো এখুনি ?

কর্তাবাবু বললেন—কাশীতে—

—কাশীতে কার কাছে ?

কর্তাবাবু বললেন—গুরুদেবের কাছে—

এর পর আর বেশিদিন বাঁচেননি কর্তাবাবু। এর পর থেকে মা-মণিই সংসারের সব চাবিকাঠি হাতে নিয়েছিলেন। খাজাঞ্চিখানার হিসেব রোজকার মতো তিনি বুঝে নিতেন। জগত্তারণবাবু অ্যাটর্নী হয়েছেন। মামলা-মকদ্দমার ব্যাপারটা তিনিই এসে বুঝে-শুনে নিয়ে যেতেন। পড়াশোনা হলো না খোকনের। কিছু উপায় নেই। কিন্তু খরচটা বেঁধেছেন মা-মণি। খাজাঞ্চিখানার খাতা থেকে অনেক বাজে-খরচের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন।

পুরোহিত-বাড়িতে মাসকাবারি বন্দোবস্ত ছিল একখানা ধুতি, একটা শাড়ি, আধমণ ডাল, একখানা সিধে, আর গামছা।

গুরুদেবের নামে বাৎসরিক প্রণামী বাবদ বরাদ্দ ছিল নগদ পাঁচশো টাকা, পাঁচখানা ধুতি, গুরুমায়ের জন্যে তিনটে শাড়ি, এককৌটা সিঁদুর, তিনমণ চাল, আর দুখানা গামছা।

তারপর দান-খয়রাতেরও বরাদ্দ ছিল নানা জায়গায়। হলুদপুকুরের জ্ঞাতিদের পুজোর সময় কাপড়, চাদর আর টাকা। এমনি কত অসংখ্য! সংসার সেনের যখন সময় ছিল, তখনকার রেওয়াজ সব। বংশের উন্নতি হয়েছে, ভোগ বেড়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে দান-খয়রাতের ফর্দও সব বড় হয়েছে ক্রমে ক্রমে। তখন ধানকল ছিল, তেলকল ছিল বেলেঘাটায়, খড়ের আমদানি-রপ্তানি ছিল, তেজারতী মহাজনী ছিল। যখন ছিল তখন ছিল। এখন নেই, এখন সব কমাতে হবে। ভগবান দিন দেন তো আবার হবে। আবার বড় হবে ফর্দ।

মা-মণি নিজে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনেছেন আর কালিদাসবাবু পড়ে গেছেন।

মা-মণি বলেছেন—পাঁচখানার বদলে দুখানা ধুতি করে দিন—আর নগদ টাকা একশো—ওতেই চালাতে হবে—

তারপর বললেন—বড়বাবুর হাতখরচ গেলমাসে কত লিখেছেন ?

—আজ্ঞে, চব্বিশহাজার সাতশো তেষট্টি টাকা ন'আনা।

খোকনের আর সে স্বভাব নেই। অনেক শুধরেছে এখন। আগের চেয়ে অনেক শুধরেছে। আগে মাসের মধ্যে চারদিন পাঁচদিন বেরোত। এখন একদিন। কোনও কোনও মাসে বড়জোর দু'দিন। কিন্তু যাবার সময় মাস্টার জগত্তারণবাবু সঙ্গে থাকে। যাবার আগে মা-মণির পায়ের ধুলো নিয়ে যায় এখনো। বৌমার সঙ্গে দেখা করে যায়। মা-মণি পেস্তা-বাদামের শরবত তৈরি করে দেন। মাছের মুড়ো দেন পাতে। বাড়ির ঘি।

খোকন এসে প্রণাম করে পায়ে।

বলে—মা, অনুমতি করো, আসি তাহলে ?

গিলে-দেওয়া পাঞ্জাবি পরে কোঁচানো শান্তিপুরে ধুতি পরে এসে বারান্দার ওপরে পম্পশু জোড়া খুলে রেখে মা-মণির মহলে আসে। নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকায় খোকন।

মা-মণি বলেন—এই শরীর খারাপ নিয়ে আবার কেন যাচ্ছ বাবা !

বড়বাবু বলেন—শরীরটা কেমন ম্যাজ্ ম্যাজ্ করছে বড়ো—

মা-মণি বলেন—তাহলে একবার ডাক্তারবাবুকে ডাকতে পাঠালে হতো—

—বড়বাবু বললেন—ও ডাক্তার-ফাক্তারের কম্ম নয়, মা—ও মিছিমিছি টাকা নষ্ট, সুখ নষ্ট—

মা-মণি তখন সাবধান করে দেবেন—কিন্তু বেশি অত্যাচার যেন না হয় দেখো বাবা, শরীরটা আগে—

ভক্তি করে পায়ের ধুলো নিয়ে বড়বাবু তখন চলে যাবেন বৌ-মণির ঘরে।

বৌ-মণি এতক্ষণ সমস্ত শুনেছে। সকাল থেকেই শুনে আসছে। সকাল থেকেই আয়োজন করেছে, সকাল থেকেই সেজেছে গুজেছে। আলমারি থেকে ভালো শাড়িটা বের করে পরেছে। কানের হাতের নাকের গয়নাগুলো বার করে পরেছে। সব সাজ-গোজ এই পাঁচ মিনিটের জন্যে।

বড়বাবু ঘরে ঢুকতেই বৌ-মণি এগিয়ে এসেছে।

বড়বাবু বলেছে—আমি চললুম, জানলে—

—আবার আজকে কেন ?

—যাই একটু ঘুরে আসি।

—না গেলেই নয় ? তোমার শরীরটা খারাপ, এই ভাঙা শরীর নিয়ে আবার কেন যাচ্ছো ?

বড়বাবু বললেন—শরীরটা বড় ম্যাজ্ম্যাজ্ করছে আজ—যাই, কেমন ?

তারপর গুলমোহর আলি গাড়ি জুতেছে। আবদুল দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থেকেছে। আর নফর ? যে-নফরের সারা মাসে পাত্তাই পাওয়া যায় না, যে-নফরের দাম এ-বাড়িতে কানাকড়িও নেই কারো কাছে, সেই নফরেরই আবার অন্য মূর্তি তখন। ভেতরে লাল সিল্কের গেঞ্জি, টাটকা-টাটকা চুল ছেঁটেছে, পাতলা পাঞ্জাবির পকেটে পয়সা ঝন্ঝন্ করছে—

চীৎকার করে ডাকে—গুলমোহর, গাড়ি লে আও—

কত কাজ তার! অ্যাটর্নী-অফিস থেকে জগত্তারণবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে সে-ই। একা সমস্ত ঝক্কি নিয়েছে। শুধু কি জগত্তারণবাবু! বড়বাবুর তদ্বির-তদারক তাকেই করতে হবে। বড়বাবুর ধুতির কোঁচা যদি মাটিতে লুটিয়ে কাদা লাগে তো নফরকেই তা তুলে ধরতে হবে। বড়বাবুর তোয়াজ করাই এখন কাজ নফরের। বড়বাবুর ঘুম পেলে

নফর-ই তাকিয়াটা এগিয়ে দেয়। বড়বাবুর সিগারেট তেষ্টা পেলে দেশলাই দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দেয়।

বাড়ির সামনে হৈ-চৈ বাধিয়ে তোলে নফর—অ্যাই, হট্ যাও সব, হট্ যাও—এখন নেই হোগা—বড়বাবু বেরোচ্ছে এখন—

খাজাঞ্চি কালিদাসবাবু, মুহুরিবাবু তাকিয়ে তাকিয়ে গ্যাখে আর মনে মনে গজরায়।

চুপি চুপি বলে—নফর বেটার দেমাক গ্যাখো—বেটা যেন আজ লাট না বেলাট—

কিন্তু নফরের মুখের ওপর কারো কথা বলবার সাহস থাকে না সেদিন। কারো সাহস হয় না নফরের ব্যাপার দেখে হাসে মুখের ওপর। বড়বাবুও সেদিন কথায় কথায় নফর আর নফর।

সেদিন সকাল থেকেই বড়বাবু ডাকাডাকি করে—হ্যাঁ রে, নফর কোথায় ?

নফরও গিয়ে একেবারে পায়ের ধুলো নিয়ে জিভে ঠেকিয়ে দেয়।

বলে—আমাকে স্মরণ করেছেন বড়বাবু!

বড়বাবুর কথা বলতে যেন কষ্ট হয়। বলেন—কোথায় থাকিস তুই, জগত্তারণবাবুকে একবার খবর দিতে হবে যে—

—আজ্ঞে, এক্ষুনি খবর দিচ্ছি বড়বাবু।

বলেই ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে আসে। তখন যদি কেউ সামনে পড়লো তো মার-মার কাণ্ড বেধে যাবে।

—দেখতে পাস্‌না উল্লুক কোথাকার, কানা নাকি! চল্ বড়বাবুর কাছে চল্—শিগ্‌গির চল্—

হাতে বোধ হয় মাথা কাটতে পারে তখন নফর। তারপর যখন বড়বাবু মা-মণিকে প্রণাম সেরে বৌ-মণির সঙ্গে দেখা করা সেরে নিচে নামবে, জগত্তারণবাবু দাঁড়িয়ে থাকেন, তিনি এগিয়ে যাবেন। বড়বাবু

আস্তে আস্তে গাড়িতে উঠলে জগত্তারণবাবু পেছন পেছন উঠবেন। আবদুল দরজা বন্ধ করে দেবে।

নফর গাড়ির মধ্যে একবার উঁকি মেরে বলবে—তা হলে গাড়ি ছেড়ে দেব হুজুর ?

বড়বাবু বলবেন—ছাড়্, ছাড়তে এত দেরি কেন তোদের ?

আর কথা নেই। ভূষণ সিং গেট্ খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। নফর তড়াক করে ওপরে গুলমোহর আলির পাশে বসে বলবে—চালাও—চালাও পান্সী বেলঘরিয়া—

বড়বাবুর বাগানবাড়ি বেলঘরিয়ায়। জগত্তারণবাবুকে অনেকবার বলেছিলেন মা-মণি—আপনি তো এ-বাড়ির সব জানেন, আইনের কাগজপত্তোর সবই তো আপনি দেখেছেন, এস্টেটের আর সে-আয় নেই, এখন একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলবেন—

জগত্তারণবাবু বলতেন—আমি তো বলি মা-জননী, একটু একটু শুধরেছে আজকাল—এখন মাসে একবার করে যান, এর পর দেখবেন একেবারে বন্ধ করে দেবে—

মা-মণি বলেন—আর শরীরটাও তো আগের মত নেই কিনা খোকার—

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি, এখন এক গেলাস খেলেই টলতে থাকেন।

মা-মণি বলেন—যা ভালো বোঝেন আপনি করবেন, আপনি ওর মাস্টার ছিলেন—আপনিই ওর গুরুর মতন—আপনার ওপরেই ভরসা—

ছেলে চলে যাবার পর মা-মণি ডাকেন—বৌমা—

বৌ-মণি এসে দাঁড়ান।

মা-মণি বলেন—খোকা দেখা করে গেল তোমার সঙ্গে ?

বৌ-মণি বলেন—হ্যাঁ—

—কবে আসবে কিছু বলে গেল ?

বে:-মণি বলেন—তাড়াতাড়িই আসবেন বললেন—

প্রত্যেকবারেই তাড়াতাড়ি করে আসার কথা দেন বড়বাবু। তবু প্রতিবারই দেরি হয়। তিন দিন তিন রাতের আগে কখনও ফিরতে পারেন না। বেলঘরিয়া গিয়ে বড়বাবু পেঁছিবার আগেই খবর পেঁছে যায়। নফর গাড়ি থেকে নেমেই বড়বাবুকে ধরে নামিয়ে দেয়। ধুতির কোঁচাটা নিজের হাতে তুলে দেয়। তারপর বলে—আপনি নেমে আস্থন স্তার, নেমে আস্থন আগে—

বড়বাবু বলেন—বোতলগুলো রইল—

নফর বলে—আপনি কিছু ভাববেন না স্তার, নফর আছে—

তারপর বাড়ির চাকর-বাকর দৌড়ে আসে। এসে বড়বাবুর পায়ের ধুলো ঠেকায় মাথায়।

বলেন—তোরা আছিস কেমন সব রে ?

সবাই বলে—আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে ভালোই আছি—

জগত্তারণবাবু একপাশে নফরকে ডেকে বলে—নফর, তবলচিকে খবর দিয়েছিস তো, এখনও এসে পেঁছুল না—

নফর বলে—সব ঠিক আছে অ্যাটর্নীবাবু, আপনি ভাববেন না, নফর ভোলে না কিছু—

—আর মালা ? ফুলের মালা ?

নফর বলে—ফুলওলা গাড়ি করে ফুল নিয়ে দিয়ে যাবে, সাত টাকা বায়না দিয়ে এসেছি—

হাঁপাতে হাঁপাতে বড়বাবু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠেন। নফর আগে আগে গিয়ে ফরাসের ওপর চাদরটা ঠিকঠাক করে ঝেড়ে দেয় হাত দিয়ে। তারপর তাকিয়া গোলগাল করে দিয়ে বলে—বস্থন স্তার আয়েস করে—

তারপর ডাকে—অ্যাই, রাধারমণ না শ্যামরমণ—কী নাম তোর ?

চাকরটা থতমত খেয়ে বলে—গোকুল—

—ওই হলো, হাওয়া কর্না বেটা, দেখছিস্ বড়বাবু ঘামছেন—

বড়বাবু বললেন—এক গেলাস জল—

নফর লাফিয়ে উঠলো।

—অ্যাই, কে আছিস্ ষষ্ঠি—ষষ্ঠিচরণ না গুষ্টিচরণ কী নাম যেন বেটার—

গোকুল বললে—আমি যাচ্ছি—

নফর বললে—তুই না, এই যে ষষ্ঠিচরণ, বেশ ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে বরফ দিয়ে জল আনবি এক গেলাস,—

তারপর নিচু হয়ে বড়বাবুর মুখের কাছে মুখ নামিয়ে বললে—সোডা ঢালবো স্তার ?

বড়বাবু যেন বিরক্ত হলেন। বললেন—হবে, হবে, অত তাড়া কিসের, একটু হাঁফ ছাড়তে দে রে বাবা—

নফর হাতের ধুলো-টুলো ঝেড়ে নিয়ে বললে—আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে স্তার,—

জগত্তারণবাবু বললে—নফর, তবলচি এলো কিনা ভাখ্ তো তুই আগে—

বড়বাবু বললেন—আবার তবলচি কেন মাস্টার ?

জগত্তারণবাবু বললে—একটু গান-টান হবে না ? অনেকদিন গান-টান শুনিনি কিনা, ভালো বাজায় আর কি, লহরাতে খুব নাম আছে লোকটার—

বড়বাবু বললেন—একটু জিরোতে এসেছিলাম এখানে, তা-ও তুমি দেবে না দেখছি মাস্টার—

—তা তুমি যদি না চাও বড়বাবু তো থাক্ না, এই তবলচি এলে ওকে চলে যেতে বলবি নফর—

বড়বাবু বললেন—এই তোমার বড় দোষ মাস্টার, তুমি অমনি রাগ করলে—বাজাতে এসেছে তো চলে যাবে কেন আবার। তামাক দিয়ে বল্ নফর—

নফর বললে—এই ষষ্টিচরণ, বেটা জল দিয়ে চলে যাচ্ছিস্—তামাক দে—ততক্ষণ সিগ্রেট খান স্যার—ব'লে সিগারেটের কেস্‌টা খুলে বাড়িয়ে দিলে সামনে।

হঠাৎ পাশের দরজার পরদা নড়ে উঠলো।

নফর কানের কাছে মুখ এনে বললে—ওই মা আসছেন বড়বাবু—

তসরের কাপড়ে আগাগোড়া মুড়ে গিন্নীবান্নি মানুষটি ভেতরে এলেন।

জগত্তারণবাবু একটু নড়ে জায়গা করে দিলে। বললে—আসুন মা, এই দেখুন কাকে ধরে নিয়ে এসেছি—

বড়বাবু বললেন—না না, আমি তো ক'দিন থেকেই ভাবছি আসবো, জুৎ করতে পারছিলাম না তাই—

বড়বাবু পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন।

মহিলাটি বললেন—থাক্ থাক্, বেঁচে থাকো বাবা, আমিও ক'দিন থেকে ভাবছিলাম ছেলে আসে না কেন, আর—টেঁপিরও তো শরীরটা ভালো নেই কিনা—

নফর মুকিয়ে ছিল। বললে—কেন, বৌদিমণির আবার কি হলো মা?

—দাঁত কনকন করছে কাল থেকে, কিছু মুখে দিতে পারে না—পানের নেশা আছে তো, পান না মুখে দিলে আবার একদণ্ড থাকতে পারে না আমার টেঁপি—

নফর বললে—এখন কেমন আছেন বউদিমণি?

মহিলাটি বললেন—আজকে দুটো পান খেয়েছে, হামানদিস্তেতে ছেঁচে দিলুম। বলি, ভাত না হলেও চলবে কিন্তু পান না হলে তো

তোর চলবে না—তা সে-কথা থাক্—তোমার মা-মণি কেমন আছেন বাবা ?

বড়বাবু বললেন—ভালো—

—আহা, ভালো থাকলেই ভালো বাবা, তুমি মা-মণিকে দেখো বাবা, সংসারে মায়ের তুল্য আর কেউ নেই বাবা জানলে—আর আমার বৌমা কেমন আছে ?

বড়বাবু বললেন—ভালো, আপনি কেমন আছেন ?

—আমার আর থাকাথাকি বাবা, টেঁপিকে আর তোমাকে রেখে যেতে পারলেই হয় বাবা। টেঁপিকে তাই বলি, ছেলের আমার কোনও ঝঞ্ঝাট নেই, তোর কপালেই আমার অমন ছেলে জুটেছে—। তা তোমার শরীর ভালো আছে তো ? কী খাবে বাবা আজ রাত্তিরে ?

বড়বাবু বললেন—আপনি নিজের হাতে রান্না করে যা দেবেন তাই খাবো মা, আমার খাওয়ার জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না—

মহিলাটি বললেন—আজ মুরগীর চপ করেছি বাবা,—আর সরু পেশোয়ারী চালের পোলোয়া—

নফর বললে—তোফা তোফা,—

বড়বাবু বললেন—থাম্ তুই নফর, আপনার এই শরীর নিয়ে আবার এত খাটতে গেলেন কেন মা ?

—খাটুনি কেন বলছো বাবা, ছেলের জন্যে কি মায়ের কষ্ট হয় বাবা ? আহা, টেঁপিও সকাল থেকে খুব খাটছে আমার পেছনে—

বড়বাবু বললেন—শরীর নষ্ট করে রান্না-বান্না করার কী দরকার ছিল—

—না, তা হোক, ছেলে খাবে আর ঠুঁটো হাতে বসে থাকবো আমি, তা কি হয়, টেঁপি বললে মুরগীর চপ্ তুমি খেতে ভালোবাসো, তাই… আচ্ছা বোসো বাবা, আমি টেঁপিকে ডেকে দিচ্ছি—

টেঁপি আসুক। সংসার সেনের আমল থেকে এ-বংশে কত টেঁপি কত পুতুলমালা কতবার এসেছে কতবার গেছে তার হিসাব খাজাঞ্চিখানার নথিপত্র দেখলে হয়ত মিলবে। হয়ত আরো অনেক কিছুই মিলবে সেখানে। এ-বংশের আয়-ব্যয়ের হিসেবের সঙ্গে সেই অন্যায় আর অপব্যয়ের একটা ফিরিস্তিও মিলবে। দীর্ঘদিন ধরে একটা ধারা চলে আসতে আসতে ক্ষীণ হয়ে এলেও, তার জের শিরা-উপশিরার মধ্যে আজও চলেছে। মুরগীর চপ্, ফুলের মালা, তবলচি, টেঁপির দাঁতের ব্যথা,—কিছুই কোনদিন বাদ পড়েনি এখানে, এখনও পড়লো না। এর পর টেঁপিও আসবে। আর শুধু টেঁপি নয়, জুয়েলার্স মনসুখলাল-কোম্পানির শেঠজীও আসবে। হীরে, পান্না, চুনী, জহরত, জড়োয়া গয়নার নমুনাও বার করবে। সেবারের টাকাটা এবারে শোধ হবে। এবারের জড়োয়ার নেক্‌লেসটার দাম পরের বারে মিটলেই চলে যাবে। বড়বাবু তো নতুন অচেনা আদমী নয়। চেনা ঘর। হাজার হাজার লাখ লাখ জড়োয়া পড়ে থাক্ না—। তাগাদা করবে না জুয়েলার্স মনসুখলাল অ্যাণ্ড কোম্পানি। আর তারপরেই খাজাঞ্চিখানার খাতায় বড়বাবুর নামে এই দিনের মোট খরচা লেখা হবে—চব্বিশ হাজার সাতশো তেষট্টি টাকা ন'আনা—

রাত তখন অনেক। মা-মণির বারান্দার জানালা থেকে যতদূর দেখা যায় সব জায়গায় অন্ধকার। সব বাড়ির আলো নিভে গেছে এখন। বৌ-মণির ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। বাইরে সিন্ধুমণি অপেক্ষা করতে করতে বুঝি কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

গুরুপুত্র অনেকক্ষণ চলে গেছেন। কাশীর পণ্ডিত গিরিগঙ্গাধর বাচস্পতির ছেলে। অনেক টোল, অনেক বংশের গুরুদেব তিনি।

গুরুপুত্র যাবার আগে বলেছিলেন—এই চিঠিটা বাবা আমাকে

দিয়েছেন, কর্তাবাবু কুড়ি বছর আগে এ-চিঠিটা বাবার কাছে লিখেছিলেন—

তখনও চিঠিটা পড়ে আছে। কর্তাবাবুর হাতের লেখা চিঠি। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে চিঠি লিখেছিলেন বটে। কিন্তু সে চিঠি যে কাশীতে বাচস্পতি মহাশয়কে লিখেছিলেন তা এতদিন পরে জানা গেল।

মা-মণি বার বার চিঠিটা নিয়ে দেখতে লাগলেন।

কখনও লেখাপড়া শেখেননি তিনি। লিখতে পড়তে কেউ শেখায়ওনি। কবে একদিন পাঁচবছর বয়সে এ-বাড়ির বউ হয়ে এলেন। সে তো অনেক কাল আগেকার কথা। ভুলেই গেছেন সব। এতবড় বাড়ি, এত টাকা এদের। সব তাঁর অধিকারে।

কর্তাবাবু বলতেন—এই তো নিয়ম—

মা-মণি বলতেন—নিয়ম কি আর বদলায় না?

—কে বদলাবে?

মা-মণি বলতেন—কেন, তুমি বাড়ির কর্তা, তুমিই বদলাবে?

কর্তাবাবু বলতেন—বদলে লাভ কী, এ-বাড়িতে একটু নিয়ম মেনে চলাই ভালো।

মা-মণি বলতেন—তা বলে বসে বসে সব মাইনে খাবে?

কর্তাবাবু বলতেন—কিন্তু ছাড়িয়ে দিলেই বা যাবে কোথায় ওরা? ও কাজ করছে এ-বাড়িতে, ওর বাবা কাজ করেছে, ওর ঠাকুদা করেছে, ওর ঠাকুর্দার বাবা কাজ করেছে, আবার ওর ছেলে হলেও কাজ করবে এ-বাড়িতে—ওদের জন্মই হয়েছে আমাদের সেবা করবার জন্যে—তুমি ও-সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না—

তিরিশ সের দুধ হতো গরুর। সব কি খেত কেউ! ফেলা-ছড়া ক'রে-ক'রেও ফুরোত না সব। মা-মণি হুকুম দিলেন—ঘি হবে বাকী

দুধে, রান্নাবাড়িতেও লোক রয়েছে, কিছুই অভাব নেই যখন তখন নষ্ট হবে কেন ?

শুধু কি দুধ ! সেই ছোটবেলা থেকে যখন বুঝতে শিখলেন, দেখলেন এখানে অন্যায় করলে সইবে না, অত্যাচার করলেও সহ্য হবে না। অনিয়মও সইবে না। কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো আস্তে আস্তে মা-মণির অনেক কিছুই সহ্য হয়ে এলো। শুধু সহ্য হলো না মিছে-কথা।

বলতেন—মিছে-কথা বললে আমি সহ্য করবো না কিছুতেই—

প্রথম প্রথম খোকন বড় হওয়ার পর হঠাৎ এক-একদিন কোথায় থাকতো, সারাদিন সারারাত বাড়ি আসতো না। দু'দিন পরে হয়ত আবার বাড়ি এলো।

মা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় ছিলে এতদিন ?

খোকন বলতো—আট্‌কে পড়েছিলুম মা, আসতে পারিনি—

—কোথায় আট্‌কে পড়েছিলে ?

এর কোনও উত্তর নেই।

মা-মণি আবার বললেন—বলো ?

কিছুতেই উত্তর দেয় না।

—বলো !

খোকন বললে—বন্ধুর বাড়ি।

—কোন্ বন্ধুর বাড়ি ?

আর বলতে পারে না।

মা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—সঙ্গে কে কে ছিল ?

খোকন বলেছিল—মাস্টার।

—জগত্তারণবাবু ? আর কে ?

খোকন বললে—নফর।

জগত্তারণবাবুকে ডেকে পাঠানো হলো। জগত্তারণবাবু এসে বললেন—মিছে-কথা আপনার কাছে বলবো না মা-জননী, আমরা গিয়েছিলাম পানবাগানে—

মা-মণি বললেন—আচ্ছা আপনি যান—

তারপর ডাক পড়লো নফরের। নফরকে অকথা কুকথা বলে ধমকালেন খুব। তারপর হুকুম হলো নিমগাছে বেঁধে নফরকে পঁচিশ ঘা জুতো মারা হবে। সে কী দিন একটা! নফরই খোকাবাবুকে খারাপ করে দিচ্ছে। যেখানে-সেখানে নিয়ে যায়। বদ ছেলে কোথাকার! বাড়িসুদ্ধ হৈ-চৈ পড়ে গেল। সকাল থেকে আর কোনও কথা নেই কারো মুখে। এক কথা কেবল—নফরকে নিমগাছে বেঁধে পঁচিশ ঘা জুতো মারা হবে।

লোহার-নাল-বাঁধানো জুতো। নিমগাছের সঙ্গে আস্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়েছে নফরকে।

ভূষণ সিং জুতো দিয়ে মারছে আর দর-দর করে রক্ত পড়ছে গা থেকে। আর নফর চীৎকার করছে— আর করবো না গো, আর করবো না—ছেড়ে দাও—

গুণে গুণে পঁচিশ ঘা। যখন পঁচিশ ঘা শেষ হলো, তখন নফর প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেছে। লাক-লাইন দড়িটা খুলতেই ঝপ্ করে খসে পড়লো মাটিতে!

মা-মণি সন্ধ্যেবেলা ডেকে পাঠালেন জগত্তারণবাবুকে।

জগত্তারণবাবু এলেন।

ওপর থেকে মা-মণি বললেন—সংসার সেনের বংশের ছেলে পানবাগানে রাত কাটাবে এটা বড় লজ্জার কথা মাস্টারমশাই,—

জগত্তারণবাবুও স্বীকার করলেন—আজ্ঞে, লজ্জার কথাই তো মা-জননী—

মা-মণি বললেন—তা আপনি এতদিন কর্তাবাবুর সঙ্গে ছিলেন, আপনার এই জ্ঞানটা হলো না ? বাজারে কি আর ভালো জায়গা নেই ? কর্তাবাবুর বেলঘরিয়ার বাগানবাড়িটা তো পড়ে রয়েছে, সেখানে যেতে পারেন না ?

জগত্তারণবাবু বললেন—আজ্ঞে, আমি তো নিমিত্ত মাত্র—

মা-মণি বললেন—না, আপনি একটা ভালো-গোছের মেয়ে দেখুন, তাকেই রাখুন বাগানে, আমি খরচা যা লাগে দেব।

জগত্তারণবাবু সেদিন পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেলেন।

তা সেইদিনই টেঁপিকে খুঁজে বার করলেন জগত্তারণবাবু। রামবাগানের একটা ঘরে মা'র সঙ্গে ছিল। বড় দুরবস্থা। তাকেই জগত্তারণবাবু এনে দেখিয়ে গেলেন মা-জননীকে। মেয়েটি বেশ মোটা-সোটা। মাজা-ঘষা রং। মেয়েটি মা-মণিকে প্রণাম করতে গেল।

মা-মণি দু'পা পেছিয়ে গেলেন। বললেন—ছুঁয়োনা বাছা—থাক্—

গড়ন-পেটন দেখলেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভাবে পরীক্ষা করলেন। কোনও খুঁত নেই।

মা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নাম কী ?

মেয়েটি বললে—টেঁপি—

মা-মণি টেঁপির মাকে বললেন—তোমার মেয়ে বেশ বাছা, এখন তোমার মেয়ের বরাত—যাও তোমরা—

তারপর হুকুম হলো—বেলঘরিয়ার বাগানের বাড়িটা মেরামত করতে হবে। খাট বিছানা পালঙ সবই আছে। কিন্তু কর্তাবাবুর চলে যাবার পর কেউ আর ব্যবহার করেনি ওগুলো। তোষক বালিশ গদি সবই পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। আলমারির কাচ ভেঙে গিয়েছিল। সব আবার সারানো হলো। তারপর শুভদিন দেখে টেঁপি আর টেঁপির মা এসে উঠলো।

এর পর যথাসময়ে বিয়ে হলো, বে-মণি এল। কতদিন কেটে গেল। একলা হাল ধরে চালেছিলেন মা-মণি। একলা এই সমস্ত পরিবারের জীবনযাত্রার মাথায় বসে তিনি কলকাঠি নেড়ে এসেছেন এতদিন, কেউ আপত্তি করেনি। যে নিয়ম ভেঙেছে তিনি তাকে শাস্তি দিয়েছেন।

কিন্তু আজ বুঝি তাঁরই শাস্তির পালা!

মা-মণি কর্তাবাবুর হাতের লেখা চিঠিখানা আবার দেখলেন। ছোট ছোট কালির আঁচড়। কিছু বোঝা যায় না। কুড়ি বছর আগে কর্তাবাবু লিখেছিলেন তাঁর কুল-গুরুদেব গিরিগঙ্গাধর বাচস্পতিকে।

গুরুপুত্র বললেন—কর্তাবাবু বলেছিলেন এ-সম্পত্তির যতখানি স্বর্ণর প্রাপ্য, ততখানিই প্রাপ্য নফরের। বাবা বললেন—ও-ও তো বিবাহিত স্ত্রীর সন্তান—ওর সমান অধিকার আছে!

—কিন্তু আমি যে দত্তক গ্রহণ করেছি!

—কিন্তু এই নফরকেই দত্তক গ্রহণ করবেন তিনি, এ-কথা তিনি বাবাকে বলেছিলেন। কিন্তু দত্তক-গ্রহণের দিন কাশীর লোককে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেয়নি আপনার দরোয়ান!

মা-মণি বললেন—কিন্তু তা হলে সে পাপ কার? তার জন্যে আমার খোকন কেন ভুগবে?

গুরুপুত্র বললেন—কাশীতে যে-সত্য তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, সে-সত্য আর বদলানো যায় না, আমার বাবা তাই বললেন।

মা-মণি বললেন—কিন্তু যিনি কথা দিয়েছিলেন তিনি তো এখন আর নেই?

—কিন্তু আপনি তাঁর ধর্মপত্নী, আপনি তো আছেন? তাঁর পুণ্যফল কিংবা কর্মফল সব তো আপনাকেই গ্রহণ করতে হবে।

মা-মণি কেঁদে পড়েছিলেন তখন।

সত্যিই কী নিয়ে বাঁচবেন তিনি! এই বংশের বিধবা হয়ে এরই সমাধি তিনি রচনা করে যাবেন! অনেক অপব্যয় হয়েছে অবশ্য, আজো হচ্ছে, হয়ত আরো হবে, কিন্তু তাঁর যেন মনে হলো এতদিন পরে তিনি হেরে গেলেন। কর্তাবাবু থাকলে তাঁর তেমন ভাবনা ছিল না। কিন্তু আজ যেন তাঁর পায়ের তলার মাটি আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। এ বাড়িতে খোকনেরও যতখানি অধিকার, নফরেরও ঠিক ততখানি। সে কেমন করে হয়। আর মঙ্গলা! মনে করতে চেষ্টা করলেন তিনি। সেই মঙ্গলা! কাশী যাবার আগে বার বার সন্দেহ হয়েছিল তাঁর। তার চেহারা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল।

মনে পড়লো, তিনি সেইজন্যেই সেদিন বারণ করে দিয়েছিলেন—কর্তাবাবুর সামনে আসতে—

—কিন্তু আর কারো রক্ত পাওয়া গেল না?

—আপনার সঙ্গে সকলের রক্ত তো মিশবে না। তাই বাবা লক্ষণ মিলিয়ে তাকেই বেছে নিয়েছিলেন।

—কিন্তু বিয়ে হবার কী দরকার ছিল?

—আপনাদের বংশের পবিত্রতা রক্ষার জন্যে।

'মা-মণি বললেন—কত লোকের রক্ত কত লোককে দেওয়া হচ্ছে, তাতে তো কেউ আপত্তি করে না?

—তা করে না, কিন্তু বাবা কেমন করে তা অগ্রাহ্য করবেন? তাঁর শিষ্যের জীবন-সংশয় যেমন একদিকে, অন্যদিকে ধর্মরক্ষা!

একবার সিঁড়ির কাছে গিয়ে ডাকলেন—সিন্ধু—

সিন্ধুমণি সেই ছোট জায়গাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ভোরবেলাই গুরুপুত্র চলে যাবেন। আর দেখা হবে না। কর্তার চিঠিখানা আবার মুঠোর মধ্যে থেকে বার করলেন। স্বামীর শেষ হাতের লেখা। মাথায় ঠেকালেন একবার। তুমি এ কী করলে? আমাকে

বলোনি কেন ? তোমার সমস্ত কৃতকর্মফল আমি হাসিমুখে মাথায় তুলে নিতাম। কিন্তু কেন তুমি অবিশ্বাস করলে ? কেন তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারলে না ? আমার সংসার, আমার সন্তান, আমার শ্বশুর-স্বামীর জন্মভূমিকে আমি কেমন করে দু'ভাগ করে ভোগ করবো ? তুমি যেখানেই থাকো, এর জবাব দাও তুমি ! এর উত্তর দাও ! তুমি ভেবেছ তুমি তো মুক্তি পাবে ! তুমি মুক্তি পেয়েছ, কিন্তু আমাকে কী বাঁধনে বেঁধে রেখে গেলে ? আমি কেমন করে মুক্তি পাবো ? এ সমস্ত যে আমার ? তুমি তোমার সত্য রেখেছ, তোমার কথা রেখেছ ? কিন্তু আজ কুড়ি বছর পরে আমার কাঁধে এ কোন্ বোঝা চাপিয়ে দিলে ? তীর্থের সত্য যদি মিথ্যে হয় তো সে-পাপ তুমি যেখানেই থাকো তোমাকেও স্পর্শ করবে আমাকেও করবে। তুমি আমি কি আলাদা ?

কর্তাবাবু চিঠি লিখেছিলেন গুরুদেবকে—সে-চিঠি গুরুপুত্র পড়ে শুনিয়েছেন—

পরম ধ্যানেন বন্দিত শ্রীশ্রীগিরিগঙ্গাধর বাচস্পতি

মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু—

শত সহস্র প্রণামা নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীচরণ ধ্যান সদা সর্বদা প্রার্থনা করিতেছি।···

এমনি করেই আরম্ভ করেছেন কর্তাবাবু। মৃত্যুর ক'দিন আগের চিঠি। শেষ জীবনে বড় অস্থির হয়েছেন তিনি মনে আছে। সেই অবস্থায় কাউকেই কোনও কথা বলতে পারেননি সাহস করে। নিজের ধর্মপত্নী, নিজের ঔরসজাত সন্তান থাকতে তিনি দত্তক গ্রহণ করেছেন। তাঁর নিজের সন্তান তাঁরই বাড়িতে চাকরের মতো জীবন যাপন করে। তাঁরই ধর্মপত্নী তাঁরই বাড়িতে দাসীর কাজ করে। এ তিনি প্রকাশ করতে পারেন না। আপনি গুরুদেব, স্ত্রীর জীবনরক্ষার জন্যে আপনার আদেশেই তা করেছি। কিন্তু আপনি আমায় জানিয়ে দিন, তাদের

গ্রহণ না করে আমি মহাপাতক হয়েছি কিনা! পরজন্মে আমি মুক্তি পাবো কিনা! কিন্তু কেমন করে আমি গ্রহণ করবো তাদের! আমার সংসার, আমার বংশ এ-সমস্ত বিবেচনা করে আমি কেমন করে ওদের গ্রহণ করি। আমি লোকলজ্জা, সংস্কার এইসবের ভয়ে সন্তানকে মা'র কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি। মা জানেনা তার সন্তান তার কাছেই আছে। আজ জীবনের শেষ সন্ধিক্ষণে পৌঁছে আমি আপনার কাছে এই পত্র দিলাম। আমার শেষ ইচ্ছা আমার সম্পত্তি স্থাবর অস্থাবর সমস্ত দুই সন্তানের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। আমার চোখে দু'জনেই সমান। আমার কাছে আমার দুই স্ত্রী-ই আমার ধর্মপত্নী। আপনার আদেশে আমি যখন আর একজনকে গ্রহণ করেছি, তাকে আমার ধর্মপত্নীর মর্যাদা দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু আমি তা করিনি। এখন আপনাকেই আমি সব ভার দিয়ে গেলাম। আপনার অদৃষ্ট-গণনায় আমার প্রথম স্ত্রীর জীবৎকাল আর মাত্র কুড়ি বৎসর। কুড়ি বৎসর পরে আপনি আমার এই ইচ্ছা এই আদেশ প্রকাশ করবেন। অন্যথায় পরলোকেও আমার আত্মা অশান্তিময় হয়ে বিরাজ করবে—

দীর্ঘ চিঠি!

গুরুপুত্র নিচের ঘরে গিয়ে শুয়েছেন। তাঁর পিতারও মৃত্যু হয়েছে। নির্ধারিত সময়েই এ-সংবাদ তিনি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর জীবৎকাল তো পূর্ণ হয়ে এলো। কর্তাবাবুর মৃত্যুর পর মাত্র কুড়ি বছর। কিন্তু কুড়ি বছরের পরও যে তিনি বেঁচে আছেন। গুরুর অদৃষ্ট-গণনা কি তবে মিথ্যে!

আর একবার সিন্ধুমণির কাছে গেলেন। নিঝুম নিস্তব্ধ বাড়ি। একটা বেড়াল বুঝি নিঃশব্দে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাচ্ছিল। এত রাত্রে কোনওদিন মা-মণি জেগে থাকেননি।

আবার ডাকলেন—সিন্ধু, ও সিন্ধু—

সিন্ধু ধড়মড় করে উঠে বসলো। বললে—মা—

—মঙ্গলাকে একবার ডাকতে পারিস ?

সিন্ধু বললে—মঙ্গলাকে ? এত রাত্রে ? রান্না করতে হবে ?

—না, তুই একবার শুধু ডেকে নিয়ে আয় তাকে।

মঙ্গলা এসেছিল অনেক রাত্রে। মা-মণি বলেছিলেন—সিন্ধু, তুই শুগে যা—তোকে আর জেগে থাকতে হবে না—

মঙ্গলা শুধু এইটুকু জানে যে, মা-মণির চেহারা দেখে যেন চমকে উঠেছিল সে। মা-মণিকে অবশ্য বেশিবার দেখেনি মঙ্গলা। তবু সেই রাত্রে যেন সত্যিই চমকে উঠলো চেহারা দেখে।

মা-মণি বলেছিলেন—বোস্—

কখনও তো মা-মণির সামনে বসবার কথা নয়। বসার নিয়মই নেই এ-বাড়িতে। এ সবাই জানে। তবু মঙ্গলা বসলো। বসে মুখ নিচু করে রইল। ঘুমোতে-ঘুমোতে উঠে এসেছে, উঠে মা-মণি ডেকেছে শুনে আরো অবাক্ হয়েছে। কিছু রান্না করতে হবে। গুরুপুত্র এসেছিলেন। তিনি খাননি। রান্নার সব যোগাড় করে রেখেও তিনি খেলেন না। খবরটা পেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল আবার। শিশুর-মা-ও পাশে ঘুমোচ্ছিল। কিন্তু ডাকতেই মনে হলো কে যেন স্বপ্নের মধ্যে ডাকছে তাকে। স্বপ্নই দেখছে যেন সে।

—কাশীতে গিয়েছিলি আমার সঙ্গে, তোর মনে আছে ?

—মনে আছে মা-মণি !

—আমার খুব অসুখ হয়েছিল তা তোর মনে আছে ?

—তাও মনে আছে মা-মণি !

—আমার অসুখের সময় কর্তাবাবুকে দেখেছিলি তুই ?

মঙ্গলা যেন চমকে উঠলো একটু। মা-মণির মুখের ওপর মুখ তুলেই তক্ষুনি আবার নামিয়ে নিলে।

—কথা বলছিস্ না যে ?

মঙ্গলা আস্তে আস্তে মুখ নিচু করে বললে—সে অনেক দিন আগেকার কথা, মা-মণি।

মা-মণি যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—তুই আমারই বাড়িতে বসে আমারই খেয়ে পরে আমারই সর্বনাশ করেছিস ?

মঙ্গলা কেঁদে ফেললে, ছু'চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো।

মা-মণি বলতে লাগলেন—আমার কত সাধের সংসার তুই জানিস্ ? সেই সংসারে তুই আগুন লাগিয়ে দিলি ? আমি এখন কী করবো !

মঙ্গলার হাত-পা যেন সব আড়ষ্ট হয়ে এল। এতদিন পরে এই কথা বলবার জন্যে এত রাত্রে তাকে ডাকালেন মা-মণি ?

—আমার স্বামী, আমার ছেলে, আমার ছেলের বউ—তোর জন্যে সবাইকে জলাঞ্জলি দিতে হবে ? তুই আমার এমন সর্বনাশ করতে পারলি ?

—মা-মণি, আমি যে···

—থাম্ তুই, দুধ-কলা দিয়ে আমি কালসাপ পুষেছিলাম কিনা, তাই এমন করে আমার সব নস্ট করে দিলি ! আমি এখন কী করবো ! আমার যে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে—

মঙ্গলা মা-মণির পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়লো।

বললে—মা-মণি, বিশ্বাস করুন, আমার কোনও দোষ নেই, আমি পেটের দায়ে আপনার বাড়িতে কাজ করতে এসেছিলাম—

মা-মণি বললেন—তোকে আমি বলেছিলাম না যে কর্তাবাবুর চোখের সামনে না-পড়তে ?

—আমি তো বরাবরই চোখের আড়ালে থাকতাম, মা !

—তবে কেন এমন সর্বনাশ ঘটালি ?

—আমার মরণ-দশা হয়েছিল, মা-মণি ! আমাকে আপনি তাড়িয়ে

দিন মা এ-বাড়ি থেকে, আমি মরে বাঁচি, আমার আর বাঁচার সাধ নেই !

মা-মণি একটু যেন কী ভাবলেন। বললেন—তোর ছেলেকে তুই দেখেছিস্ ?

মঙ্গলা হঠাৎ চোখে আঁচল দিলে। শেষকালে আর চাপতে পারলো না। চিরকালের চাপা মানুষ মঙ্গলা। নিজের সমস্ত জীবনের দুঃখ কষ্ট শোক সব যেন হঠাৎ ফেটে বেরোলো তার সেই মুহূর্তে।

মা-মণি চীৎকার করে উঠলেন—বেরো হতভাগী, বেরো—বেরো এখান থেকে—পারিস তো গলায় দড়ি দিগে যা—বেরো আমার সামনে থেকে—

অন্ধকার বাড়ি। তার খোঁদলে খোঁদলে যেন মৃত আত্মারা হঠাৎ সজীব হয়ে উঠলো। মাঝরাতের নাটকে এখানেই বুঝি যবনিকা পড়বে। তার আগে শুধু একটু একমুহূর্তের ছেদ। মঙ্গলা টলতে-টলতে সিঁড়ি দিয়ে নামলো, তারপর একবার এদিক ওদিক দেখে নিলে। ভয় করতে লাগলো তার। সিঁড়ির ওপর টিয়াপাখীটা একবার পাখা-ঝাপ্টানি দিলে। বেরালটা তার পায়ের কাছ দিয়ে কোন্ দিকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচলো যেন।

আর তারপর···

ভোর তখনও হয়নি। বেশ রাত আছে। জগন্নারণবাবু খুব খেয়েছিলেন সেদিন। মুরগীর চপ্ হয়েছিল। শুধু মুরগীর চপ্ই নয়। টেঁপির মা আগে চাটের দোকানের খাবার রাঁধতো। তার হাতের কাঁকড়ার দাড়া দিয়ে পেঁয়াজ-রসুনের তরকারি যারা খেয়েছে, সে-পাড়ায় তারা এখনও আফসোস করে। বলে—আহা, টেঁপির মা'র রান্নার মতো রান্না আর খেলুম না—

তখন টেঁপির মার অবস্থা খারাপ ছিল। তারপর জগত্তারণবাবুর দয়ায় এখন টেঁপির বরাত ফিরেছে। বেলঘরিয়ার বাগানবাড়িতে উঠে এসেছে। টেঁপির মা'র হীরের নাকছাবি হয়েছে, টেঁপির জড়োয়া গয়না হয়েছে। এখন অনেক সুখ।

সেই শেষরাত্রেই কে যেন বাইরে চীৎকার করে উঠলো।

—বড়বাবু, বড়বাবু!

তখন নফরও অচৈতন্য। গান-বাজনা হয়েছিল অনেক রাত পর্যন্ত। অনেক দিন পরে ভালো খেয়েছে। পেট ভরে খেয়েছে। মুরগীর চপ্ চেয়ে-চেয়ে নিয়ে খেয়েছে। জগত্তারণবাবু পাশে বসে খাচ্ছিল।

বললে—খাও হে নফর—খাও, পেট ভরে খাও, লজ্জা কোরোনা—

নফর বলে—আজ্ঞে লজ্জা আমার নেই, লজ্জা থাকলে আমার এই দশা—

বড়বাবু বললেন—মুরগীটা বেশ ভালো, মাস্টার—

জগত্তারণবাবু বললে—রান্নাটা বড়বাবু বড্ড ভালো এর—হোটেলে রাঁধতো আগে—

গুলমোহর আলি, আবদুল ওরাও খেয়েছে পেট ভরে। শুধু মুরগী নয়। টেঁপির মা বললে—আজ রান্নাটা বেশ জুৎ করতে পারিনি, আদা-বাটা বেশি হয়ে গেস্‌লো—

নফর বললে—পোলাওটাও খুব ভালো হয়েছে, মা—

খাওয়াচ্ছিল টেঁপির মা। বললে—ভালো হবে কী করে বাছা, খাঁটি ঘি কি পাওয়া যায়, নেহাত ছেলে খাবে তাই মাখন গালিয়ে নিয়েছিলাম—

—আঃ—জগত্তারণবাবু একটা আরামের ঢেকুর তুললে।

বললে—খাওয়াটা বেশ হলো বড়বাবু, কর্তাবাবুর সঙ্গে কতদিন বেলঘরিয়াতে খেয়ে গিয়েছি—

খাওয়া হয়েছে। খাওয়ার আগে আবার গান হয়েছে। টেঁপি

ঠুংরিটা গায় ভালো। 'হামসে না বোল রাজা' ব'লে যখন কোমল নিখাদে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সে কি মজা! আর নিখাদ ব'লে নিখাদ! ওই নিখাদটার দাম-ই লাখ টাকা।

বড়বাবু বললেন—তোমার গলা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব এবার—

নফর শুনছিল। বললে—আহা, বউদিমণির গান শুনলেই পেট ভরে যায়—

গানের মধ্যে মনসুখলাল জুয়েলার্স কোম্পানির দালালও এসেছে। নিখাদের দাম সেখানেই উঠে গেছে বোধহয়। টেঁপির মুখেও হাসি বেরিয়েছিল নেকলেস্‌টা দেখে।

তারপর যত রাত বেড়েছে, তত মজা বেড়েছে। বড়বাবু যত বলেছে—এই শেষ, আর নয়—তত বোতল এসেছে আর খালি হয়ে গেছে। নফরও টেনেছে লুকিয়ে লুকিয়ে। ভালো জিনিস। এ খেতে পাওয়ার ভাগ্য চাই।

খেতে খেতে সব যখন ফরসা, তখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। বড়বাবু কাত হয়ে শুয়ে ছিল বিছানার ওপর। টেঁপির মা এসে টেঁপিকে ডেকে নিয়ে গেছে। বলেছে—আয়, ঘরের ভেতরে আয় মা,—আরাম করে শুবি আয়—

টেঁপি টেঁপির-মার সঙ্গে আলাদা ঘরেই শুয়েছিল। টেঁপির মা'রও বেশ নেশা হয়েছিল একটু।

হঠাৎ বাইরে চীৎকার হতেই টেঁপির মা'র নেশা কেটে গেল যেন।

বললে—ষষ্টিচরণ, ছাখ্‌ তো রে কে ডাকছে—

বাইরে তখনও কে দরজার কড়া নাড়ছে আর চীৎকার করছে—বড়বাবু, ও বড়বাবু—

তা সেদিন খুব ভোরেই ঠাকুরমশাই উঠেছিলেন। কলতলায় গিয়ে

মুখ-হাত পা ধুয়ে জপ-আহ্নিক করে নিলেন। তাঁকে সকালবেলাই যেতে হবে।

পয়মন্তকে ডাকলেন—ওরে শুনছিস, মা-মণিকে একবার খবর দে, আমি যাচ্ছি—

সমস্ত বাড়ি তখন প্রায় নিঝুম। তিনি নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলেন।

হঠাৎ পয়মন্ত দৌড়তে দৌড়তে এল।

—কী হয়েছে রে?

ভেতর থেকে হঠাৎ সিন্ধুমণির আর্ত কান্নার শব্দ শোনা গেল।

—কী হয়েছে রে?

—সব্বনাশ হয়ে গেছে ঠাকুরমশাই!

এ-সব গল্প আমরা বড় হয়ে শুনেছি। আসল ব্যাপার জানতে পেরেছি পরে। কিন্তু তখন কিছুই জানতাম না আমরা।

আমরা তখন ছোট, পাড়ার সবাই বাড়িটার সামনে জড়ো হয়েছে সেদিন। লাল পাগড়ি-পরা পুলিশ এসেছে ক'টা, আর একজন দারোগা। এ পাড়ার মধ্যে এ-বাড়িতে আগে কখনও পুলিশ আসতে দেখিনি। তবু এ বাড়ির সম্বন্ধে কৌতূহল আমাদের বরাবর।

—কী হয়েছে মশাই?

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে লোকেরা পুলিশ দেখে থেমে যায়। বলে —কী হয়েছে মশাই এখানে? এত পুলিশ কেন?

—বাড়িতে কে গলায় দড়ি দিয়েছে শুনছি!

—কে গলায় দড়ি দিয়েছে?

—কে জানে মশাই, কে? বড়লোকের বাড়ির ব্যাপার, এ-বাড়ির খবর কে জানবে?

আস্তে আস্তে আরো ভিড় বেড়ে গেল। রোদও বাড়ছে। পাশের

বাড়ির ভদ্রলোকদের ততক্ষণ আপিস যাবার সময় হয়েছে। কয়েকজন চলেও গেল।

তারপরেই হঠাৎ গাড়ি চালিয়ে এল গুলমোহর আলি।

—হট্ যাও, হট্ যাও—

বড়বাবুর গাড়ি এসেছে। ভেতরে বড়বাবু বসে ছিলেন। ভগবতীচরণ-বাবুও বসে ছিল। নফর গাড়ির মাথায়। গাড়িটা থামতেই নফর তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজাটা খুলে বললে—আসুন স্যার—নেমে আসুন—

তারপর দারোগাবাবু বড়বাবুর সঙ্গেই ভেতরে ঢুকে গেলেন। কৌতূহল যেন আরো বাড়লো সকলের। আমরা আরো সামনে এগিয়ে গেলাম।

আজ এতদিন পরে এই সংকীর্তন যে গাইছি, তারও একটা কারণ আছে বৈকি।

এবার পুজোর সময় কাশীতে গিয়েছিলাম।

দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে আছি। হঠাৎ দেখি নফর! সেই ছেঁড়া গেঞ্জি, ময়লা কাপড়।

আমিই প্রথমে ডাকলাম।

—নফর!

নফর আমার ডাক শুনেই এগিয়ে এল। বললে—দাদা, আপনি এখেনে!

বললাম—তুমি এখানে কবে এলে বলো আগে।

নফর বললে—আপনি বুঝি বাড়ি বদলেছেন? আপনাকে আর পাড়ায় দেখতে পাইনা তাই।

বললাম—তুমি এখানে কার সঙ্গে এসেছ?

নফর বললে—জগত্তারণবাবুর সঙ্গে। বড়বাবু মারা গেছেন শুনেছেন বোধহয় ?

অবাক হলাম। বললাম—না, কবে মারা গেছেন— ?

নফর অনেক গল্প বলে গেল। শেষজীবনটা বড়বাবুর স্বাস্থ্য নাকি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। গলায় কিছু ঢুকতো না আর।

খানিক পরে নফর বললে—বড়বাবুর বাড়ি-টাড়ি সব সম্পত্তি-টম্পত্তি জগত্তারণবাবু কিনে নিয়েছেন তা জানেন তো ?

বললাম—সেকি ! সেই অ্যাটর্নী জগত্তারণবাবু ?

জগত্তারণবাবু যে শেষ পর্যন্ত সব গ্রাস করবে তা অবশ্য তখনই বুঝতে পারতাম। তবু কেমন যেন দুঃখ হলো। মা-মণি নিজেকে বলি দিয়ে সংসার সেনের বংশের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিলেন। সুবর্ণনারায়ণ সেনের ভবিষ্যৎ-ও নিরাপদ করতে চেয়েছিলেন ! কিন্তু শনি যে কোন্ দিক দিয়ে কখন রন্ধ্রে প্রবেশ করবে তা যদি তিনি জানতেন !

মনে আছে পুলিশ জিজ্ঞেস করেছিল সিন্ধুমণিকে—তোমার সঙ্গে শেষ কখন কথা হয়েছিল মা-মণির ?

সিন্ধুমণি উত্তর দিয়েছিল—হুজুর, মঙ্গলাকে ডেকে দিতে বলে তিনি আমায় শুতে বললেন—আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম নিজের বিছানায়, তারপর আর কিছু জানি না, সকালবেলা উঠে দেখি এই কাণ্ড—

বৌ-মণি সারারাত ভালোই ঘুমিয়েছিলেন। কিছুই টের পাননি। বড়বাবু বেলঘরিয়ায় চলে যাবার পর আর মা-মণিকে দেখেননি।

একে একে সবাইকেই প্রশ্ন করেছিল পুলিশ।

মঙ্গলাকে জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি কতদিন এ-বাড়িতে কাজ করছো ?

—মনে নেই কত বছর, ছোটবেলা থেকে। বিধবা হবার পর থেকেই।

—শেষ যখন তোমার সঙ্গে মা-মণির কথা হয়, তখন তিনি কী বলেছিলেন ?

মঙ্গলা কী যেন ভেবেছিল খানিকক্ষণ। বলেছিল—তিনি আমার ওপর রাগ করেছিলেন—

—কেন ? তোমার রান্না ভালো হয়নি বলে ?

—না, তিনি বলেছিলেন আমি তাঁর ক্ষেতি করেছি।

—কী ক্ষতি ?

মঙ্গলা বলেছিল—তা জানি না।

—সংসারে আপনার বলতে তোমার কে আছে ?

—এক ছেলে আছে।

—কোথায় সে ?

মঙ্গলা বলেছিল—তা জানি না—

এর পর বড়বাবু জগত্তারণবাবু সকলেরই জবানবন্দী নিয়েছিল পুলিশ। শেষে ডাক পড়েছিল নফরের।

পুলিশ জিজ্ঞেস করেছিল—সংসারে তোমার আপনার বলতে কেউ আছে ?

—আজ্ঞে না, হুজুর।

—তোমার মা-বাবা ?

—না হুজুর, আমি কাউকেই দেখিনি। তারা কোথায় তাও জানি না।

—এ বাড়িতে তোমার কাজ কী ?

—আজ্ঞে হুজুর, মোসায়েবী। বড়বাবুর মোসায়েব আমি। হুজুর স্মরণ করলেই আমি সঙ্গে যাই।

—কোথায় যাও ?

—আজ্ঞে বেলঘরিয়ায়।

শেষ ডাক পড়েছিল ঠাকুরমশাই-এর! তাঁরও সেদিন যাওয়া হয়নি শেষ পর্যন্ত।

পুলিশ জিজ্ঞেস করেছিল—শেষ যখন আপনার সঙ্গে মা-মণির কথা হয় তখন কত রাত?

ঠাকুরমশাই বলেছিলেন—রাত বোধ হয় দ্বিতীয় প্রহর—

—তিনি কী-কী কথা বলেছিলেন আপনাকে?

—অনেক কথাই বলেছিলেন।

পুলিশ আবার জিজ্ঞেস করেছিল—তাঁর কি খুব মন-খারাপ ছিল?

—হ্যাঁ।

—আপনি এতদিন পরে হঠাৎ কাল রাত্রেই বা এসেছিলেন কেন?

—আমার বাবার মৃত্যু-সংবাদ দিতে। আমার বাবা ছিলেন তাঁর গুরুদেব, গুরুদেবকে তিনি খুব ভক্তি করতেন।

পুলিশ জিজ্ঞেস করলে—শুনে কি তিনি মুষড়ে পড়লেন?

—ভীষণ মুষড়ে পড়লেন। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন, তারপর অনেক রাত হয়েছে দেখে আমিও বাইরে চলে এলাম,—

—তার পর?

ঠাকুরমশাই বললেন—তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি নিজের ঘরে শুয়ে পড়েছি—আর কিছুই জানি না, এখন ভোরবেলা শুনি এই কাণ্ড!

পুলিশ আরো সব কত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল, এখন আর সে-সব কথা মনে নেই।

হঠাৎ নক্কর বললে—যাই দাদা, জগত্তারণবাবুর জন্যে এদিকে রাবড়ি কিনতে এসেছিলাম, তিনি আবার ঘুম থেকে উঠে রাবড়ি না খেলে গালাগালি দিতে আরম্ভ করবেন—

হাসি এলো। বললাম—কিন্তু তোমার আর কোনো বদল হলো না নফর, তুমি সেই একরকমই রয়ে গেলে—

—আর দাদা!

নফরও হাসতে লাগলো।

বললে—আর দাদা, আমি তো আর ওঁদের মতো বড়লোকের ছেলে নই—

ব'লে নফর চলে গেল।

হঠাৎ খেয়াল হলো—মঙ্গলার কথাটা তো জিজ্ঞেস করা হলো না নফরকে। মঙ্গলা কি তাহলে এখন জগদ্ধারণবাবুর বাড়ির রাঁধুনি! কে জানে!

কিন্তু আমার কানে যেন তখনও নফরের শেষ কথাটাই কেবল কানে বাজছে—আমি তো আর ওঁদের মতো বড়লোকের ছেলে নই—আমি তো আর ওঁদের মতো বড়লোকের ছেলে নই···